গাজায় ইজরায়েলী ধ্বংসলীলা চলছে

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

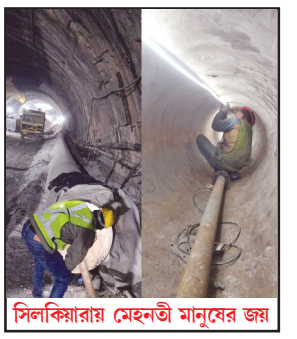
সিলকিয়ারায় মেহনতী মানুষের জয়

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০২৩ ■ ৫১তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ৫-৬ ডিসেম্বর '২৩, চার দফা দাবিতে

দিনরাত্রিব্যাপী কেন্দ্রীয় অবস্থান কর্মসূচী

সংবিধান ও কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে মেনে বকেয়া মহার্ঘভাতা দিতেই হবে রাজ্য সরকারকে। স্বচ্ছতার সাথে শূন্যপদগুলিতে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাসের শিকার সরকারী কর্মচারীরা, তাঁদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের মাধ্যমেই এর জবাব দিতে হবে। মহার্ঘভাতা যদি অধিকার না হত, তাহলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তার পক্ষে রায়দান করত না। আমাদের মাথায় রাখতে হবে দাবি আদায় লড়াই করেই অর্জন করতে হয়। অধিকার কেড়ে নিয়ে বলার স্পর্ধা করছেন তিনি ছুটি দিচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামতে হবে।

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

রাস্তাই একমাত্র পথ, যেখানে মানুষ অধিকার ফিরে পায়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অতীত ঐতিহ্য রয়েছে মানুষের স্বার্থে লড়াই করার, গরিব মানুষকে সাহায্য করার, সেই লক্ষ্যে সংগঠিত হয়েছেন নির্দ্বিধায় কারাগারে গিয়েছেন। আপনারা সেই ঐতিহ্যের

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

উত্তরাধিকার। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারটা অচল করে দিতে হবে। আর্থিক সঙ্কটের দোহাই দিয়ে কর্মচারীদের সংবিধান স্বীকৃতি অধিকার বঞ্চিত করছেন, ওদিকে ক্লাবগুলোকে বিপুল অর্থ দিচ্ছেন। বিজ্ঞাপনে বিপুল অর্থ খরচ করছেন। দুর্গাপুজোয় টাকা ঢালছেন যা সংবিধান বিরোধী। গণতন্ত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ দুর্নীতি, আর আমাদের রাজ্যে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও বৃহত্তর পরিসরে সংঘটিত করতে হবে। আমার মৌলিক অধিকার প্রতিবাদ করার। আমার সংবিধান স্বীকৃত অধিকার রক্ষার্থে রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা দুর্নীতি ও লুঠের সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলতে সকলকেই দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যেভাবে আশেপাশের বাড়িতে আগুন লাগলে আমরা প্রতিবেশীরা জলের বালতি নিয়ে এগিয়ে আসি। নিজেদের অর্জিত অধিকার রক্ষা সহ, রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে যে অবস্থান কর্মসূচী আপনারা সংগঠিত করছেন যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে, লড়াইয়ের তীব্রতা বাড়াতে আপনারা যুক্তমঞ্চ করেছেন, সেভাবেই যুক্ত আঘাত করুন, We Shall Over Come। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ৫-৬ ডিসেম্বর ২০২৩ দিন-রাত্রিব্যাপী অবস্থান কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেন, আমাদের পরিস্থিতিকে জয় করতেই হবে। আমরা যদি পরাজিত হই, তাহলে সভ্যতা পিছিয়ে যাবে। ধর্ম ও মন্দিরের ভিত্তিতে নরেন্দ্র মোদী যে নীতি প্রয়োগ করতে চাইছে, তা অতি ধ্বংসাত্মক। উত্তরাখণ্ডে ধর্মীয় ক্ষেত্রকে একসূত্রে বাধার কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন টানেলে আটকে রইলেন, শেষপর্যন্ত তাদের উদ্ধার করতে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতাই কাজে লেগেছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বলছেন এই নির্মাণ সঠিক নয়, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকেরা মনে করেন তারা যেটা ঠিক করেছেন করবেন, সেটাই সঠিক। তাই

দিনরাত্রিব্যাপী অবস্থানের এক অংশ

আমাদের লড়াইটা আজকে স্বৈরাচার, কুসংস্কার, অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষের সংবিধান গোটা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সংবিধান। কিন্তু বাবাসাহেব ডঃ বি. আর আম্বেদকর যখন এই সংবিধানকে গণপরিষদে অর্পণ করেছিলেন, তখনই তিনি বলেছিলেন, সংবিধান দেশের মানুষের কাছে কিভাবে উপস্থিত হবে, তা নির্ভর করে এই সংবিধান যারা কার্যকর করবেন তার ওপর। সংবিধান যতই ভালো হোক তা কার্যকর যারা করবেন তারা যদি Bad People হন তাহলে সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলি দেশের প্রান্তিক মানুষের, গরিব মানুষের কোনও কাজে আসবে না।

আভাস রায়চৌধুরী

আবার সংবিধান খারাপ হলেও একে কার্যকর যারা করবেন তারা যদি Good People হন তাহলে তা মানুষের উপকারে আসে। ভারতবর্ষের সংবিধান সমাজতন্ত্রের পক্ষে পথ দেখায়। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রর পথ দেখায়। ভারতবর্ষের সংবিধান প্রতিটি দেশবাসীকে সমান অধিকার দিয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্র গঠনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সম্পদ তৈরি হয়, পরবর্তীতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বীমা জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে আমাদের সম্পদ, আমাদের দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে দেশবাসীর কষ্টের অর্থ তুলে দেওয়া হচ্ছে এমন শিল্পপতিদের হাতে যারা অর্থ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামতে হবে।

রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যৌথমঞ্চের আহ্বানে ৪ দফা দাবিতে বিগত ৫-৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ দিন-রাত্রিব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী পালিত হয় ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে। এর আগে প্রতিটি জেলায় সাফল্যের সাথে এই কর্মসূচী পালিত হয়। সমাবেশ পরিচালনা করেন মানস দাস, মোহনদাস পণ্ডিত, শান্তনু অধুর্য, বাবলু বিশ্বাস, বলাই শঙ্কর মিত্র, সমীর গিরি, উজ্জ্বল চক্রবর্তী ও রতন ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। ৪ দফা দাবির সমর্থনে প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, সমাবেশ থেকে যে ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে প্রস্তাব গৃহীত হবে, তার কার কাছে প্রেরণ করা হবে তা নিয়ে যৌথমঞ্চের নেতৃত্বদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনায় এ বিষয়টি উঠে আসে যে, মুখ্যমন্ত্রীর যে মনোভাব বা মানসিকতা তাতে তার কাছে প্রস্তাব পেশ অর্থহীন। আবার পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপালের ভূমিকা অনেকটাই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসকদলের অনুচরের মতো। স্বাভাবিকভাবেই রক্ষকই যখন ভক্ষকের ভূমিকায়, তখন হক বুঝে নেওয়ার পথ প্রশস্ত করতে আমাদের রাজপথে অবস্থান করতে হচ্ছে। মানুষ কখন এলাকায় রাত জাগে, যখন চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামি বেড়ে যায়। আমাদের রাজ্য এই মুহূর্তে চোর, ডাকাত, গুণ্ডাদের অবাধ বিচরণ স্থল হয়ে উঠেছে। আমাদের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করা, মানুষের অধিকাররক্ষার লড়াইতে সামিল আমরা। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জনবিচ্ছিন্নতা তৈরির চেষ্টা করছেন, বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য বিধানসভায় বলছেন। কিন্তু বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন ২০১১ সালে সোনারপুরে ২ জানুয়ারির বক্তব্য আমরা ভুলে যাইনি। বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে ডি.এ পান আর আমাদের রাজ্যে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হয় মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন

দেবব্রত রায়

বাড়াতে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন বিধানসভা ভাঙচুরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর আমাদের দেশের প্রধামন্ত্রী লোকসভায় প্রবেশের পূর্বে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। পরবর্তীতে সেই ভবনের পরিবর্তে নতুন ভবন নির্মাণ করেন। দেশের সংবিধানকে মেনে চলার প্রশ্নে দুই শাসকেরই অনীহা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই শুধু নিজেদের দাবি নয়, দেশ ও রাজ্য বাঁচানোর লড়াইতে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। একাংশের পুঁজিপতিদের সম্পদ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে। অপরদিকে এক বৃহৎ অংশের মানুষের দৈনিক আয় ১৭৮ টাকা। ধর্মীয় বিভাজন ও জাতপাতের বিভাজনের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে লুটে খাওয়ার বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া

মঞ্চে উপস্থিত সভাপতিমণ্ডলী সহ নেতৃবৃন্দ

মেহনতীর লড়াইতে আরো বেশি বেশি করে সামিল হতে হবে। লাগাতার

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

‘‘আমি মেশিনের হব প্রতিদ্বন্দ্বী’’

জন হেনরি। নাম তার ছিল জন হেনরি।

মুন্না কুরেশি, ফিরোজ কুরেশি, ওয়াকিলরা কি বিখ্যত মে দিবসের গানটি শুনেছিলেন? হয়তো শোনেননি। কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সেই বিখ্যাত গানের নায়ক জন হেনরিকে উত্তরাকাশির সিলকিয়ারাতে নিয়ে এলেন তো এইসব শ্রমজীবীরাই। টানা ১৭ দিন ধ্বস নামা সিলকিয়ারা টানেলে মৃত্যুকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছিলেন আটকে থাকা ৪১ জন শ্রমিক। দেশি-বিদেশী বিশেষজ্ঞের দল আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে পাথুরে পাহাড়ী গভীর খুঁড়ে এগোতে গিয়ে বারে বারে থমকে গিয়েছে উদ্ধার কাজ। উৎকণ্ঠায় অসুস্থ হয়ে পড়া ৪১ শ্রমিকের পরিজনদের সামনে কোনো দিশা নেই। সকলকে চূড়ান্ত হতাশ করে বিদেশী ড্রিলিং মেশিন অগার একসময় ভেঙে গেল। মাটির সমান্তরাল পথ ছেড়ে উলম্ব বা ভার্টিকাল পথে পাহাড় ফুঁড়ে টানেলের ছাদ ভেঙে উদ্ধারের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। বিদেশী সুরঙ্গ বিশেষজ্ঞ ডিক্স বললেন, উদ্ধার কাজ শেষ হতে হতে বড়দিন এসে যাবে। চারিদিকে চূড়ান্ত হতাশা। আটকে থাকা শ্রমিক পরিবারগুলিতে অমাবস্যার অন্ধকার, উৎকণ্ঠার পাহাড়। তখনই দিল্লী থেকে আনা হল কিছু শ্রমিককে। তাদের পেশাদারি নাম র‍্যাট মাইনার। ইঁদুরের মতোই পাথর কেটে কেটে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসাধ্য সাধন করল ওরা। মুন্না কুরেশি শেষ পাথরটা সরাতেই গোটা দেশ উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হল। মুন্না কুরেশিরা জন হেনরির মতোই যেন গেয়ে উঠল ‘‘আমি মেশিনের হব প্রতিদ্বন্দ্বী’’। কী বললেন মুন্না? বললেন, ‘দেশের জন্য কাজ করেছি, এমন আনন্দ পেয়েছি যে ভাষায় বলা যাবে না।’

কিন্তু মুন্নাদের মতো শ্রমিকরা কি জানে শ্রমিকদের জীবন নিয়ে খেলে, শ্রমিকদের নিরাপত্তা, পরিবেশের নিরাপত্তার কথা না ভেবে চারধাম হাইওয়ে দেশের স্বার্থের চেয়ে অনেক বেশি বিজেপির রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেওয়ার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারে এখন মন্দির নির্মাণ, সংস্কার, রিলিজিয়াস ট্যুরিজম। চারধাম অর্থাৎ কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এই চারটি তীর্থক্ষেত্রকে সংযুক্ত করার জন্য সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের নাম চারধাম হাইওয়ে। হিমালয়ের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন, শিলাস্তরের প্রকৃতি, পরিবেশবিদদের সাবধানবানী ইত্যাদি কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই ১২ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের কাজ চলছে। পরিবেশগত আইনকে ফাঁকি দিতে মোদী সরকার ৯০০ কিমি. দীর্ঘ এই সড়ক প্রকল্পকে ৫৩টি ভাগে ভাগ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট যখন বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করল এই প্রকল্পের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করার জন্য, তখন হিন্দুত্ববাদীদের প্রিয় তুরূপের তাস দেশের নিরাপত্তার ছুতো তুলে বলা হল দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে হাইওয়ে চওড়া করা দরকার।

পশ্চিম হিমালয়ে এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও পরিবেশদূষণ মূলক নানা কর্মকাণ্ডের জন্য ইতিমধ্যে নানা দুর্যোগ ঘটেছে। একাধিকবার ভূমিধ্বস এবং তার পরিণতিতে হাইওয়েগুলির ক্ষতি হয়েছে। কিছুদিন আগে ভয়াবহ বন্যায় তপোবন-বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। জ্যোশিমঠ শহর ধ্বসে তলিয়ে গেছে। যে জ্যোশিমঠ চারধাম যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। এই সবই হয়েছে সঠিক পরিকল্পনার অভাব, এই এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক যে দুর্বলতার দিকগুলি আছে তাকে গুরুত্ব না দেওয়া, পরিবেশ আইনকে তোয়াক্কা না করা—ইত্যাদি নানা কারণে। হিন্দু ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ২০২৫-এর লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ধর্মীয় ভাবাবেগ চাগিয়ে তুলতে গিয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি।

চন্দ্রযান-৩ এর সফল অবতরণের ঠিক পরের মুহূর্তেই টিভির পর্দায় লম্বা ভাষণ দিয়ে এর কৃতিত্ব নিজের বলে জাহির করতে চেয়েছিলেন মোদী। সিলকিয়ারার উদ্ধার কার্য শেষ হবার পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবার আশঙ্কায় ছিলেন দেশবাসী। সেটা না ঘটলেও, র‍্যাট মাইনার শ্রমিক ভাইরা যে অসাধ্য সাধন করলেন তার কৃতিত্ব না কেন্দ্রীয় সরকার না উত্তরাখণ্ড সরকার কেউ দেয়নি। কর্পোরেট মিডিয়াতেও মুন্না, ফিরোজ, ওয়াকিলরা পাত্তা পেল কই?

এত অপদার্থতা সত্ত্বেও বিজেপি মোদীর ইমেজ গড়ার কাজে নেমেছে। যেদিন র‍্যাট মাইনাররা ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধার করে দেশবাসিকে স্বস্তি দিল সেদিনই উত্তরাখণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বই প্রকাশ করলেন। বইটির নাম ‘Resilient India : How Modi Transformed India’s Disaster Management’। বইটিতে বলা হয়েছে, মোদীর আমলে বিপর্যয় মোকাবিলায় দেশে বিশাল পরিবর্তন হয়েছে এবং এটা হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ভূমিকায়। বইয়ে আরও লেখা হয়েছে, আর এস এস-র প্রচারক, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী এই তিন অবতারেই তিনি নাকি দুর্গতদের রক্ষায় এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন।

‘মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়’—এই ইমেজ তৈরি করতে বইটিতে সত্যের অপলাপ করা হয়েছে। গুজরাট দাঙ্গা, কোভিড মোকাবিলায় ব্যর্থতার মতো প্রসঙ্গগুলি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সময় বিজেপির পক্ষ থেকে মোদীর ইমেজ নির্মাণ এবং হিন্দুত্বের ভাবাবেগ জাগানোর কাজ দুটিই একসাথে চলবে। সামনে রামমন্দির উদ্বোধন, একে কেন্দ্র করে তুঙ্গে উঠবে হিন্দুত্বের প্রচার। মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে সিলকিয়ারায় আটক ৪১ জন শ্রমিকের কথা, আরও ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হবে আজকের জন হেনরির দল সেই উদ্ধারকারী র‍্যাট মাইনারদের কথা। জন হেনরি পশ্চিম ভার্জিনিয়ার রেল সুরঙ্গ তৈরির কাজে রত ছিলেন। কাজ আরও দ্রুত করার জন্য স্টিম ড্রিল মেশিন আনা হলে জন হেনরি সেই মেশিনের কাছে হার না মেনে, কায়িক শ্রমে মেশিনকেই হারিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আজকের হেনরিরা মেশিনকে শুধু হারায়নি, মানুষের মেধা ও কায়িক শ্রমে সৃষ্ট মেশিনকে কায়িক শ্রমের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়েছে। হেনরির প্রভু সাদা সর্দার, শাসকের প্রতিনিধি ভবিষ্যৎ আন্দাজ করে বলেছিল ‘‘তোর যদি জয় হয়, হবে না সূর্যোদয়, দুনিয়াটা হবে তোর বশ’’। সব শাসকেরা, নরেন্দ্র মোদিরা এই কারণেই চিরদিন জন হেনরিদের কৃতীত্ব আড়াল করতে চায়। কারণ একদিন দুনিয়াটা এদের বশেই আসবে। এই আতঙ্ক এদের তাড়া করে সদাসর্বদা।

মুন্না, ফিরোজ, ওয়াকিলারা সহ আজকের জন হেনরির দল দীর্ঘজীবী হোক। □

১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

৫-৬ ডিসেম্বর ঃ দিনরাত্রিব্যাপী কেন্দ্রীয় অবস্থান কর্মসূচী

আন্দোলনের পথে রয়েছি আমরা। ১০ মার্চ ধর্মঘট, কর্মবিরতির কর্মসূচী, হাজরা চলোর কর্মসূচী এসময়কালে প্রতিপালিত হয়েছে। সরকার যে ভাষা বুঝতে পারেন সেই ভাষাতেই কথা বলা দরকার। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য মহার্ঘভাতার বদলে ৪৫ দিন ছুটি দিই। এই মন্তব্যের প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই কর্মচারী ছুটি ভোগ করবে, না আগামীদিনে আপনাকে ছুটিতে পাঠাবে সেটা লড়াইয়ের ময়দানেই স্থির হবে। আপনি শুধু সংবিধান নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করুন। সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ পদ শূন্য, নিয়োগ নেই। যাও বা হচ্ছে তাতেও দুর্নীতি হচ্ছে। পি এস সি স্বশাসিত সংস্থা, এর স্বাধীন সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে অর্থ দপ্তরের অধীনে আনা হয়েছে। চেয়ারম্যান পদশূন্য, ২ জন রাজনৈতিক ব্যক্তি, যারা সরকার দ্বারা মনোনীত, তারা ঠিক করছেন কারা চাকরি পাবেন। পি এস সিতে কর্মরত আমাদের কর্মী নেতৃত্ব যারা স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন, তাদের ডিটেলমেন্ট করে দূরদূরান্তে বদলী করা হয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করছি। আমাদের কর্মী-নেতৃত্বরা মেরুদণ্ড বিকিয়ে দেননি প্রশাসনের এক বড় অংশের আধিকারিকদের মতো। আমাদের এই সমাবেশ করার কথা ছিল রানী রাসমনি রোডে, কিন্তু প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে আমাদের এই অবস্থান কর্মসূচী ওয়াই চ্যানেলে করতে বাধ্য হতে হয়েছে। পুলিশ-প্রশাসনের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই, সময় এক থাকে না, পরিবর্তন হয়। ক’দিন ভিলেনের মতো থাকবেন। মানুষই বাধ্য করবে আপনাদের পদের মর্যাদা রক্ষার্থে। পরবর্তীতে তিনি ৪ দফা দাবির সমর্থনে লিখিত প্রস্তাব পাঠ করেন।

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ রায় বলেন, দেশ ও রাজ্য উভয় সরকার শ্রমজীবী মানুষের বিরোধী, পার্লামেন্টে পোষ্টাল আইন পাশ করার মধ্য দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে যেকোনো মানুষের উদ্দেশ্যে পাঠানো পার্সেল দেখতে পারবেন, ভেঙে ফেলতে পারবেন। এককথায় মানুষের সমস্ত ধরনর গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চায় দেশের সরকার। ৩ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে দেশের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক সহ ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সমূহ দেশের সরকারকে হুঁশিয়ারী দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, মহার্ঘভাতা পেতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারে চলে যান, বেকারদের উদ্দেশ্যে উপহাস করে বলছেন চা, চপ শিল্পর কারখানা করতে। আমরা বলছি এটি আপনি আপনার পরিবারের ভাইপোদের দিয়ে শুরু করতেই তো পারতেন। সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। পঞ্চায়েত কর্মচারীদের হেলথ স্কীম-এর ঘোষণা টিভির পর্দায় করলেও আজ পর্যন্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি। এই ঔদ্ধত্যকে আটকাতে আরও ঐক্য প্রয়োজন। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সংগঠনের নেতৃত্ব বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, যে ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে এই অবস্থান কর্মসূচী, তার মধ্যে শিক্ষার ওপর আক্রমণ একটি বিষয়। শিক্ষা এমন একটি বিষয় যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতা। ইংরেজ আমলেও শিক্ষার ওপর আক্রমণ ছিল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ উপাচার্যকেও সরে যেতে হয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ না করার কারণে। যার মৃত্যুর ১০০ বছর পালিত হবে ২০২৪ সালে। প্রথম উচ্চশিক্ষা কমিশনে বলা আছে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার টাকা দেয় খরচের জন্য, কিন্তু টাকা কিভাবে খরচ করবে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা চলছে। প্রিভি কাউন্সিলের সভাও বিশ্ববিদ্যালয় ডাকতে পারবে না সরকার না বললে। পরীক্ষার দিন ঠিক করা যাচ্ছে না, কারণ সিন্ডিকেটের সভা করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রদানের সভাও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকরণ, গৈরিকীকরণ ঘটছে। একই সঙ্গে শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে গভীর লড়াই করতে হবে। ৬ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসে এক অন্ধকারময় দিন। কারণ ১৯৯২ সালে ওইদিন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই সময় তৎকালীন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, রাজ্য সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না। ভারতবর্ষের সংবিধানবর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, মেহনতী অধিকার রক্ষার্থে ২০২৪-এর দেশ বাঁচানোর লড়াইতে সঠিক ভূমিকা প্রতিপালন আমাদের করতেই হবে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক রূপক মুখার্জী সমাবেশকে অভিনন্দিত করে বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি, স্মার্ট মিটার এবং কয়লা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে লড়াই জারি থাকবে। পরবর্তীতে পৌর কর্মচারীদের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেন্স ফেডারেশনের পক্ষে দীপক মিত্র, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষে অনুতোষ সরদার, কে এম সি ক্লার্কস ইউনিয়নের পক্ষে অমিতাভ ভট্টাচার্য এবং জয়েন্ট ফোরাম অফ ট্রেড ইউনিয়ন কে এম সি-র পক্ষে রতন ভট্টাচার্য।

অবস্থান কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনীনিকা ঘোষ বলেন, রাজ্য ও দেশের মানুষের ওপর আক্রমণে পিছিয়ে নেই দুই সরকারই। অহরহ বঞ্চনা, অবিচার, দুর্নীতি ও লুঠপাট ঘটে চলেছে রাজ্যের বর্তমান সরকার ও কেন্দ্রের মোদী সরকারের আমলে। মানুষের অধিকার রুটি-রুজির দাবিতে আন্দোলন সংঘটিত হলেই ধর্ম ও বিভাজনের রাজনীতি দিয়ে তাকে আড়াল করা হচ্ছে। লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করতে হবে। নিজেদের দাবিতে যারা রাজপথে গাছতলায় বসে রয়েছে, যে যুবরা ইনসাফের দাবিতে পথ হাঁটছে, সকলের দাবিকে একত্রিত করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ লড়াইতে আমরাই জয়ী হব। পরবর্তীতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অধিবেশন সংঘটিত হয়। বক্তব্য রাখেন চন্দ্রনাথ সিংহ, অনুপম রায়, বিশ্বনাথ রাহা, তাপস সরকার, শেখ সৌফিক, কল্যান সরকার প্রমুখ।

এবিটিএ-র পক্ষে অনুপম রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ২৩ নভেম্বর রাজভবন অভিযানে যারা লালবাজারের লকআপে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছেন সেই সমস্ত সহযোদ্ধাদের কুর্ণিশ। তারা সেদিনও বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছিলেন আজকেও তারা আমাদের সঙ্গে রাত জাগছেন। সমস্ত সংগঠনের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ে মধ্য দিয়েই দাবি আদায় করতে হবে।

অধিবেশন চলাকালীন সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাহুল ভট্টাচার্য ও শাক্য মাইতি ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন পূরবী বিশ্বাস। এছাড়াও ৫ ডিসেম্বর রাত্রি ৮টা থেকে পরের দিন সকালে ১১টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অবস্থান কর্মসূচীর সূচনা হয় মহিলা কর্মী নেতৃত্বদের শ্লোগানের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে গণসঙ্গীত পরিশেন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম।

সমাবেশকে অভিনন্দিত করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সভাপতি অনির্বান মুখার্জী বলেন গোটা বিশ্বের বৃহত্তম সংখ্যালঘু হচ্ছেন প্রতিবন্ধীরা। গোটা পৃথিবীতে ১৩৩ কোটি মানুষ বিভিন্নরকম প্রতিবন্ধকতার শিকার। মূলধারার কর্মচারী আন্দোলনে প্রতিবন্ধী মানুষদের দাবিগুলিও যুক্ত করা দরকার। এন আর এস মেডিকেল কলেজ-এ প্রতিবন্ধী কোরপান শাহকে মিথ্যা মোবাইল চুরির অপবাদে পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনা আমরা ভুলে যাইনি। আসলে গণতন্ত্র না থাকলে পশ্চাদপদ মানুষরাই সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়। নিয়োগ দুর্নীতিতেও আমরা দেখেছি প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিরা সব থেকে বেশি বঞ্চিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার। আজকে নরেন্দ্র মোদীর চারটি পরিচয়—তিনি চাওয়ালা, তিনি ওবিসি, তিনি কেদারনাথের ধ্যানী আবার তিনি আদানির বন্ধু। আসলে তিনি মুখোশের আড়ালে রয়েছেন। রাজনীতিতে ভক্তির মতো ভয়ঙ্কর কিছু হয় না। হীরক রাজা সিনেমার যে মূল কথা ‘‘অনাচার করো যদি, রাজা তবে ছাড়ো গদি’’ বা ‘‘দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খানখান’। লেই লক্ষ্যে অনাচারী রাজাকে অপসারণে নিশ্চয়ই এই অবস্থান ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশা রাখছি। ৫ নভেম্বর রাত্রি ৯টায় সমাবেশকে অভিনন্দিত করে বিশিষ্ট আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, রেড রোডে কার্নিভালের মোচ্ছব হয়, কিন্তু গান্ধীমূর্তির পাদদেশে যোগ্য বঞ্চিতরা বসে থাকলে সরকারের হুশ ফেরেনা। সাদা খাতার মাস্টার গোটা পশ্চিমবঙ্গে অনেক আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষকরা আগামীর ভবিষ্যৎ তৈরি করে, কিন্তু সাদা খাতার শিক্ষকরা কী ভবিষ্যৎ তৈরি করবে? স্বচ্ছ নিয়োগ সহ আপনাদের দাবি দাওয়ার আন্দোলন নিশ্চয়ই আগামীর দিশা দেখাবে।

৬ ডিসেম্বর পেনশনার্স অধিবেশন পরিচালনা করেন শমীক সেনগুপ্ত ও নীলকমল সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপমতিমণ্ডলী। বক্তব্য রাখেন কাঞ্চন মুখার্জী, অসিত চক্রবর্তী দেবাশীষ দত্ত, সুবীর চাঁদ দে, অরুণা ঘোষ, শ্রীকান্ত মুখার্জী সহ নেতৃত্ববৃন্দ। এছাড়াও সমাবেশকে অভিনন্দিত করে বক্তব্য রাখেন যুক্ত কমিটির পক্ষে তাপস ত্রিপাঠী, স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে পার্থপ্রতীম দে, যৌথ কমিটির পক্ষে কৃষ্ণ সাহা ও রাজ্য

● **অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে**

আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

সুমিত ভট্টাচার্য

২০২২ সালে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতিপালিত হয়েছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষপূর্তি। এর মধ্যে বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি, কেন্দ্রের আর এস এস-বিজেপি সরকারের 'আজাদি কা অমৃৎ মহোৎসব'ও ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই 'অমৃৎ মহোৎসব' একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রকে ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে এক নয়া ভাষ্য নির্মাণের প্রকল্প। পরিকল্পিতভাবে নয়া ভাষ্য নির্মাণের এই রাজনৈতিক প্রকল্পটি ভারতের মহাকাব্যিক স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংবিধান নির্দেশিত রাষ্ট্র কাঠামোর সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাতিল করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে।

এই নয়া ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও, আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করেছি ২০১৯ ও ২০২০ সালের ৫ আগস্ট দিন দুটিতে। কারণ ঐ দুটি দিনে যথাক্রমে সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল এবং অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস করা হয়েছিল। স্বভাবতই ইতিহাস স্বীকৃত ভাষ্যের পরিবর্তে এমন একটি ভাষ্য নির্মাণের জন্য অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করা হয়েছে।

(এক)

আর এস এস-বিজেপির লক্ষ্য হল আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতীয় সধারণতন্ত্রের পরিবর্তে হিন্দুরাষ্ট্র গঠন। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যে যে অস্ত্রগুলিকে তারা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করছে, তা হল—(১) অতীত ঘটনাবলীর অনৈতিহাসিক ব্যাখ্যা ও পৌরাণিক কাহিনীকে ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান; (২) ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ গণচেতনা গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান চেতনাকে ধ্বংস করে অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার প্রসার; (৩) স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, তার পরিবর্তে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারণার প্রসার এবং (৪) ভারতীয় সংবিধানের ধ্বংস সাধন।

চতুর্থ বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও তার ওপর আক্রমণ এই নিবন্ধের মূল আলোচনার বিষয় হলেও, এর প্রেক্ষিত হিসেবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, যা আমাদের সংবিধানের ভিত্তি, তার সাথে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মৌলিক পার্থক্যগুলি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

সমাজ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ পর্বের সাথে জাতি-রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের ধারণা যুক্ত। এই ধারণার উন্মেষ ঘটে ইউরোপের মাটিতে, যার অপর বৈশিষ্ট্যটি ছিল চার্চের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ককে ছিন্ন করা। সামন্তবাদকে দেশে দেশে পরাজিত করে পুঁজিবাদের উদ্ভব রাজা অথবা সম্রাটের হাত থেকে 'ঈশ্বর' অনুমোদিত শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটেই ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের উদীয়মান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং তাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক আইনসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি একটি জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে অপর জাতিরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কাঠামোর ধারণা প্রদানে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ও জাতি রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছিল, তার সাথে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী ধারণার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

ঈশ্বরের নির্দেশে রাজার বংশ পরম্পরার শাসনের যে অধিকার, তাকে কেড়ে নিয়ে ইউরোপে নবউত্থিত জাতি-রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের ধারণা একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারি অধিবাসীদের মধ্যে নাগরিক স্বত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়েছিল। রাজার অনুগ্রহ নির্ভর প্রজার পরিবর্তে গড়ে ওঠা স্বাধীন নাগরিক চেতনাকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি অনুগত রাখার জন্য ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ধারণা গড়ে তোলা হয়েছিল। আর এটা করার জন্য নাগরিকদের মধ্যেই থাকা একটা অংশকে 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের দমন করাই হল 'জাতীয়তাবাদ'---এমন ভাবনার প্রসার ঘটানো হয়েছিল। কালক্রমে এই অপর' অংশই 'সংখ্যালঘু' হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এই ধরনের জাতীয়তাবাদ 'Majoritarianism' বা 'সংখ্যাগুরু' জাতীয়তাবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে কখনও আইরিশরা, আবার কখনও ইহুদিরা এই অপর অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে।

কিন্তু ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যকে সজীব রেখেও সাধারণ লক্ষ্যে (সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা) পরিচালিত ইনক্লুসিভ বা সর্বব্যাপী চরিত্রের জাতীয়তাবাদ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণভোমরা। ইউরোপের বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ছিল কারণ, আর জাতীয়তাবাদ ছিল তার ফল। ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশে জাতীয়তাবাদ ছিল কারণ আর ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি ছিল তার ফল।

আর এস এস-এর হিন্দু-জাতীয়তাবাদ এক কথায় বলা যায়, ওয়েস্টফেলিয়া মডেলে ফিরে যাওয়া। যেখানে সমাজের মধ্যে থাকা অপরকে (মুসলিম এবং খ্রিস্টান) দমন করাই জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেম হিসেবে স্বীকৃত। স্বভাবতই হিন্দু জাতীয়তাবাদ চরিত্রগতভাবে উগ্র এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব বা 'ভারত' ধারণার বিরোধী। ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী ইনক্লুসিভ বা সর্বব্যাপী জাতীয়তাবাদের সাথে আর এস এস-র আদর্শগত অবস্থানের পার্থক্যের কারণেই স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা কখনোই অংশগ্রহণ করেনি।

(দুই)

খুব স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দীর্ঘ প্রায় এক দশক বিজেপির অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে আর এস এস জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাদের আদর্শগত বোঝাপড়াকে ধর্মভিত্তিক সংখ্যাগুরু অংশের মধ্যে প্রবেশ করাতে চাইছে। কিন্তু সেটা করতে হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জাতীয়তাবাদী ধারণায় জনসমস্তত্ত গড়ে উঠেছে, তাকে ভাঙার দরকার হয়। আর এস এস-র নিজস্ব সাংগঠনিক তৎপরতার (মাইক্রো লেভেল সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং) পাশাপাশি বিজেপির প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সেই ভাঙার কাজটাই চলছে। আবার ঔপনিবেশিক পর্বে প্রস্ফুটিত ও প্রসারিত জাতীয়তাবাদের যে ধারণা, স্বাধীন ভারতে সেই ধারণাকেই ধারণ করেছে আমাদের দেশের সংবিধান। সংবিধানের ওপর আক্রমণ ঠিক এই কারণেই নেমে আসছে।

আমাদের দেশের সংবিধান চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে---(১) ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, (৩) সামাজিক ন্যায় এবং (৪) আর্থিক সার্বভৌমত্ব। স্বভাবতই চারটি স্তম্ভকেই দুর্বল করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই নিবন্ধে আলোচ্য বিষয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রসঙ্গটি।

বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় ভারতের ভাষাগত, ধর্মীয়, জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনেক বেশি। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে প্রায় ১, ৬১৮টি ভাষা, ৬,৪০০টি জাতি এবং ৬টি প্রধান ধর্ম রয়েছে। ৬টি প্রধান ধর্মের মধ্যে ৪টির উৎপত্তি স্থলই ভারত।

কোনো কোনো মহলের ব্যাখ্যা হল ব্রিটিশরাই এই বৈচিত্র্যসমূহকে একটা রাজনৈতিক মানচিত্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। যাঁরা এই কথা বলেন, তাঁরা ভুলে যান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল। প্রথমে সাভারকর, পরবর্তীতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ধর্মের ভিত্তিতে দ্বি-জাতি তত্ত্ব উত্থাপন করলে, তাকে সমর্থন করেছিল ব্রিটিশরাই। তাই ব্রিটিশ শাসন নয়, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী চেতনাই ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভিত্তি রচনা করেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে এই ঐক্যকে রক্ষা করা ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই লক্ষ্যে প্রথম ধাপ ছিল পাঁচ শতাধিক করদ রাজ্যকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা। দ্বিতীয় ধাপ ছিল ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে গড়ে ওঠা বিশালান্ধ্র, ঐক্য কেরালা এবং সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কাজ করা হয়েছিল। ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রশ্নে বামপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

তৃতীয় ধাপটি ছিল দ্বি-স্তরীয় শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক শাসনের মধ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনকে স্বীকৃতি দেয়, আমাদের দেশের সংবিধান তেমনই একটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের সংবিধানে দ্বিনাগরিকত্ব স্বীকৃত। অর্থাৎ একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, একই সাথে একটি নির্দিষ্ট প্রদেশেরও নাগরিক। আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থাকলেও দ্বি-নাগরিকত্বের স্বীকৃতি সংবিধান দেয়নি। এখানে সবাই শুধুমাত্র ভারতের নাগরিক। দ্বি-নাগরিকত্ব স্বীকৃত না হলেও, দ্বিস্তরীয় শাসন, অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক এক্তিয়ার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য তিনটি তালিকা তৈরি করে দিয়েছে সংবিধান—কেন্দ্র তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা।

কেন্দ্র তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু একই বিষয়ে উভয় সরকার আইন প্রণয়ন করলে, কেন্দ্রীয় আইন কার্যকরী হবে। রাজ্যের আইন কার্যকরী হবে না। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের। এই প্রসঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা হল, শুরু থেকেই অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রীয় তালিকায় রেখে দেওয়ার ফলে, আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রাভিমুখী। আদর্শ ব্যবস্থা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করা হয়নি। আবার সংবিধান প্রণয়নের সময় যতগুলি বিষয় যুগ্ম তালিকায় ছিল, তার মধ্যে অনেকগুলি বিষয়কে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে আইন প্রণয়নের প্রশ্নে কেন্দ্রের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে সময়ের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রের হাত শক্তিশালী করার এই প্রক্রিয়ার বিপরীতে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবি জোরালো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকারক এমন একটি ধারা আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা হল ৩৫৬ নং ধারা। যার বলে নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করার আগেই অপসারিত করার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রয়েছে। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধারার একাধিকবার অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে কেরালায় দেশের প্রথম কমিউনিস্ট সরকারকে ভাঙার জন্য এই ধারার প্রয়োগ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ কমিশন ও আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। আন্তঃরাজ্য পরিষদের বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীরা প্রতিনিধিত্ব করতেন। সেখানে রাজ্য ভিত্তিক সমস্যা ও চাহিদা তুলে ধরা হত, যার ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ করত এবং অর্থ কমিশন সুনির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করত। যদিও কাগজে কলমে এই ধরনের ব্যবস্থা আদর্শ বলে মনে হলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত বামশাসিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা একটি ধারাবাহিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাজ্যে বৃহৎ বা মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুমোদন বা লাইসেন্স প্রথা ছিল রাজ্যের উন্নয়নের অন্তরায়। একইভাবে মাশুল সমীকরণ নীতির মাধ্যমে আন্তররাষ্ট্র বৈষম্য তৈরি করার পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল। বিশেষত গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষার্ধে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের শাসনের অবসান ঘটে। কেন্দ্রে সরকার গঠনের প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেসের একাধিপত্য বজায় থাকলেও, রাজ্যে রাজ্যে কোথাও বামপন্থীরা, আবার কোথাও আঞ্চলিক দল ক্ষমতায় চলে আসে। ফলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে ঐ সমস্ত রাজ্যগুলির প্রতি বঞ্চনা শুরু হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি ও বিকৃতি সত্ত্বেও আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে অনেকটাই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই সংবিধান নির্দেশিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ছিল। শ্রেণী শোষণ ও শাসনকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার পরিসরকে আরও সঙ্কুচিত করা হয়। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণেই কেন্দ্রে ও রাজ্যে একদলীয় শাসনের অবসান ঘটে এবং রাজ্যভিত্তিক বহু আঞ্চলিক দল গড়ে ওঠে। এই বহুদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লড়াই জোরদার হয়নি সে কথা যেমন ঠিক, তেমনই একথাও ঠিক যে, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক বিরুদ্ধ মত গণতন্ত্রকে অনেক বেশি অর্থবহ করে তোলে। সম্মিলিত বিরুদ্ধ মতই ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

(তিন)

আমাদের দেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের মর্মবস্তু যে সার্বিক বা ইনক্লুসিভ জাতীয়তাবাদ, তাকে ধারণ করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ সংবিধান দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটা দিক হল, কেন্দ্রীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্র ও স্তরে রাষ্ট্রের সক্রিয় উপস্থিতি, কারণ রাষ্ট্রের ভূমিকা সঙ্কুচিত হলে, সংবিধান নির্দেশিত তিনটি তালিকার প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পায়। ঠিক এই কারণেই নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পর্বে—যার মূল কথা হল কৃষি, শিল্প ও পরিষেবায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস করা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হতে শুরু করে। আমাদের দেশেও একই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দুর্বল হতে থাকে। বাহ্যিক আড়ম্বর একইরকম থাকলেও এবং আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন বিষয় ইতিবাচক (যেমন লাইসেন্স প্রথা বাতিল) মনে হলেও, অন্তর্বস্তুগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দুর্বল হতে থাকে।

আর এস এস-বিজেপি শাসন যে কাজটা করেছে তা হল, নয়া উদারবাদের দাপটে দুর্বল হয়ে পড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কফিনে পুরে কবর দেওয়ার পরিকল্পনা, কারণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের কোনো ইনক্লুসিভ চরিত্র নেই। ধর্মের চাদরে সমস্ত ধরনের বৈচিত্র্যকে ঢাকা দিয়ে, ধর্মীয় পরিচয়সম্পন্ন জাতির অবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হাজির করে এক দেশ-এক নেতা, এক দেশ-এক ভোট প্রভৃতি স্লোগান হল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির সীমাবদ্ধতা শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু সমস্ত ধরনের পরোক্ষ করকে পণ্য ও পরিষেবা কর কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে এই সীমাবদ্ধতাকে আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমনকি জি এস টি চালু হওয়ার পর প্রথম পাঁচ বছর রাজ্যগুলির যে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য, তাও দেওয়া হচ্ছে না। কাগজে-কলমে আন্তঃরাজ্য পরিষদের অস্তিত্ব থাকলেও, তার সভা ডাকা হয় না। পরিকল্পনা কমিশনকে বাতিল করে নীতিআয়োগ গঠন করা হয়েছে। নীতি আয়োগের কাজ শুধুমাত্র যে যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ করা হবে, তার তালিকা প্রস্তুত করা। রাজ্যপাল পদকে ব্যবহার করে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের সাথে সংঘাত তৈরি করা, রাজ্যে রাজ্যে হাইকোর্ট সমূহে বিচারপতি নিয়োগের প্রশ্নে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, ইডি এবং সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে বিরোধী দল ও সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার, (পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন), পণ্য ও পরিষেবা কর কাঠামোর বাইরে থাকা পেট্রোপণ্যের ওপর অতিরিক্ত করের পরিবর্তে 'সেস' আরোপ করে বাড়তি পাওনার সবটুকু আত্মসাৎ করা, রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নে পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস থাকাকালীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করা হত। আদর্শগত কোনো তাগিদ থেকে নয়। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি তথা আর এস এস আদর্শগতভাবেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী। অতীতেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঠিক পরিচর্যার অভাবে, ভৌগোলিক অঞ্চল, সামাজিক গোষ্ঠী বা জাতিস্বত্ত্বা ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়েছিল। স্বভাবতই সুপরিকল্পিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবথাকে দুর্বল করার উদ্যোগ বিচ্ছিন্নবাদকে আরও বেশি উৎসাহিত করবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাতিস্বত্ত্বা ভিত্তিক সংঘর্ষ বা আমাদের রাজ্যের গোর্খাল্যান্ডের দাবি পুনরায় মাথা চাড়া দেওয়ার কারণ হল এটাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হলে, বিপদাপন্ন হয় দেশের অখণ্ডতা। অখণ্ডতা বিপদাপন্ন হলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় মেহনতী মানুষের ঐক্য। মেহনতী মানুষের ঐক্য দুর্বল হলে তা দেশি-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির কাছে 'পৌষ মাস'। তাই কর্পোরেট বান্ধব সরকাররা বিচ্ছিন্নতাবাদকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করে, এটিকে শুধু আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবেই মোকাবিলা করে। যার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হল পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য।

প্রাক্ নয়া উদারবাদী পর্বে এবং নয়া উদারবাদী সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রথম এক দশকেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্যের হাতে অধিক অর্থ ও ক্ষমতার দাবি জোড়ালো ভাবেই উঠেছিল। এক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শুধু দুর্বল হচ্ছে না, একে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ভেঙে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তাই আজকের লড়াইটা আরও কঠিন। □

অনায্য বদলী, বিক্ষোভ পি এস সি-তে

পাঁচ জন কর্মচারীর অনায্য বদলীর বিরুদ্ধে গত ৪ ডিসেম্বর '২৩, পি এস সি অফিসে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণাঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বাবলু ঘোষ। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি এবং সমিতির পি এস সি ইউনিটের পক্ষ থেকে অরুনিমা গোস্বামী। □

নভেম্বর বিপ্লব

এখনও প্রাসঙ্গিক, এখনও প্রয়োজন

উৎসর্গ মিত্র

একশো ছয় বছর আগে ১৭ নভেম্বর গোটা দুনিয়া কেঁপে উঠেছিল। প্রাকৃতিক ভূমিকম্প সে নয়, সে ছিল রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া অভূতপূর্ব এক ঘটনা, যার প্রভাবে কেঁপে উঠেছিল গোটা দুনিয়া। দুনিয়া দেখলো এমন এক ঘটনা, যার ফলে এই প্রথম কোনও দেশের শাসন ক্ষমতা এক ছোট্ট ধনী গোষ্ঠীর হাত থেকে এক লহমায় প্রায় চলে গেল শোষিত, নিপীড়িত বিরাট এক জনগোষ্ঠীর দখলে। তথাকথিত কোনও সামরিক অভ্যুত্থান এ ছিল না, ছিল না কোনও ষড়যন্ত্র কিম্বা চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ। এ ছিল সমাজের একেবারে তলায় পড়ে থাকা ক্রম-সংগঠিত হওয়া জনগোষ্ঠীর এক বিশাল ঢেউ, যা সামনের সমস্ত বাধা উড়িয়ে দিয়ে ভাসিয়ে বের করে দিয়েছিল সেখানকার স্বৈরশাসকদের। এ ছিল সবহারাদের এমন এক উৎসব, যার মধ্যে দিয়ে তারা পেয়েছিল বেঁচে থাকার অধিকার, অপার মুক্তির আনন্দ। এ ছিল বিপ্লব—মহান অক্টোবর বিপ্লব, আরও পরে যা পরিচিত হলো নভেম্বর বিপ্লব নামে, যার ঋত্বিকের নাম ছিল লেনিন... ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন!!

এমন ঘটনা দুনিয়া দেখেনি ইতোপূর্বে। এমন ব্যাপকতার কথাও কল্পনা করা যায়নি কোনওদিন, যেমনটা ঘটে গিয়েছিল সেদিন রাশিয়ার বুকে। এ কথা ঠিক যে, ওই সময়ে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর (১৮৪৮) বয়েস হয়ে গিয়েছিল সত্তর বছর। এ কথাও ঠিক যে মার্ক্সের অমর গ্রন্থ 'দাস ক্যাপিটাল'-এরও বয়েস ততদিনে হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশ বছর (১৮৬৭)। প্যারি কমিউনের বীর যোদ্ধারা খেটে খাওয়া মানুষের কব্জির জোর কতোটা হতে পারে, সেটাও ততদিনে দুনিয়াকে দেখিয়ে ফেলেছেন (১৮৭১)—এটাও ঠিক, কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবই হলো ইতিহাসের প্রথম ঘটনা যা মানুষকে দেখিয়ে দিল শ্রমিক শ্রেণী কী চায় আর কী করতে পারে! দেখালো সুস্পষ্ট ভাবে এবং সন্দেহাতীত ভাবে! মানুষ দেখলেন জন-অভ্যুত্থান কাকে বলে। দেখলেন সেই অভ্যুত্থানে এক সাথে মিলে গেছে কৃষক আর শ্রমিক, সাধারণ নাগরিক আর সশস্ত্র সেনানী। দেখলেন নারী-পুরুষ এক সাথে কদম মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে, বৃদ্ধ-যুবা এক সাথে শত্রুকে আঘাত হানছে, জয়লাভ করছে, এক সাথে আনন্দ করছে।

অবশ্যই কোনও তাৎক্ষণিক ঘটনা ছিল না এটা। এমনকি জন রীডের লেখা সেই দশ দিনেরই মাত্র ঘটনাবলী ছিল না এটা। আসলে তার আগের কয়েক দশকের শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লবী সংগঠন 'রাশিয়ান সোস্যাল ডেমক্রেটিক লেবার পার্টি'র গড়ে ওঠা (যা পরে পরিণত হয় 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন'-এ), সেই পার্টির নেতৃত্বে ধারাবাহিক সংগ্রাম ও ধর্মঘট, রাশিয়ার তৎকালীন সমাজ ও তার চলমান ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, চর্চা, বিশ্লেষণ, তার থেকে শিক্ষা লাভ এবং প্রাপ্ত শিক্ষার ওপর দাঁড়িয়ে কৌশল রচনা করা, সেই কৌশলের প্রয়োগ ঘটানো, ব্যর্থ হলে ভেঙে না পড়ে তার থেকেও শিক্ষা লাভ করে নিজেদের আরও নির্ভুল করে তোলার উপযোগী সুশৃংখল সংগঠন গড়ে তোলা শুধু নয়, তাকে আরও বাড়িয়ে তোলা এবং ফের আরও তীক্ষ্ণ আঘাত হানার দুর্বার জেদের ফসল হচ্ছে নভেম্বর বিপ্লব। রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু তাতেও ফের নয় মাসের মাথায় নভেম্বরে বিপ্লব সফল হওয়া আটকায়নি এই সব কারণের জন্যেই ।

''ধনতন্ত্রের চরম বিকাশের মধ্যেই বিপ্লবের বীজ নীহিত থাকে এবং ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যখন চরম আকার ধারণ করে, তখনই বিপ্লব সংঘটিত হয়" এই চিরায়ত ধারণার মূলেও কুঠারাঘাত করেছিল নভেম্বর বিপ্লব। রাশিয়ায় বিপ্লব যখন সফল ভাবে সংঘটিত হয়, তখন সে 'জার' নামক এক স্বৈর শাসকের অধীনস্থ পিছিয়ে পড়া শিল্পের দেশ। কিন্তু রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি দেখিয়ে দিয়েছিল কোনও সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখা সাম্রাজ্যবাদী শেকলের দুর্বলতম অংশটা যদি সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং সেই চিহ্নিত অংশে যদি সঠিক ভাবে আঘাত করা যায়, তাহলে শেকলটা ভাঙা শুধু সময়ের অপেক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির এই সাফল্য গোটা পৃথিবীর বিপ্লবী অংশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। নাড়িয়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলির মুক্তিকামী মানুষকে। দিকে দিকে শুরু হয়ে গিয়েছিল জাতীয় মুক্তির আন্দোলন।

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো যেমন, ঠিক তেমনই রুশ বিপ্লবও আবিশ্ব শোষিত মানুষকে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতে এবং তাকে বাস্তবায়িত করতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। শত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবের ঠিক পরপরই বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নিয়ে গঠিত 'তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল'ও এই কাজে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। এক পিছিয়ে পড়া দেশের থেকে বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র কায়েমের মাত্র কয়েক বছরেই রাশিয়া বা পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধুমাত্র এক উন্নত দেশেই পরিণত হয়েছে তাই নয়—রীতিমত শক্তিশালী এক দেশে পরিণত হয়ে গেছে, সেখানকার শ্রমিকেরা সেই সব যাবতীয় অধিকার তখন ভোগ করেছেন, যা কখনও কল্পনাও করা যেত না। নারীদের সমানাধিকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত, কেউ ক্ষুধার্ত নেই সেখানে—চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে চমৎকৃত এমনকি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মানুষও তাঁর নিজের দেশেও সমাজতন্ত্র গড়ার স্বপ্ন দেখবেন—এটাই তো স্বাভাবিক। লাভের লীপ্সা মেটানোর জন্যে পরিকল্পনা না বানিয়ে যদি মানুষের জন্যে, মানুষের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা বানানো যায় দেশের জন্য, তাহলে কি হয়, সেটা সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল বিপ্লবোত্তর রাশিয়া। উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত হতে, সামন্তবাদ থেকে মুক্ত হতে সমাজতন্ত্রই যে একমাত্র রাস্তা—এই উপলব্ধি মানুষের মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পেরেছিল বিপ্লবোত্তর রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নিজেদের উদাহরণ দিয়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় সবটা জুড়েই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার জবাব ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ধনবাদী দুনিয়ার লক্ষ্যবস্তুও ছিল এই নবীন রাষ্ট্রটি, যে তার আদর্শগত কারণেই ধনতন্ত্রের আগ্রাসী থাবার সামনে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে রক্ষা করছিল, তাদেরকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করছিল। আক্ষরিক অর্থেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ধনবাদী দুনিয়ার দুঃস্বপ্ন ছিল। কিন্তু সে সবই এখন ইতিহাস। চলমান ঘটনাবলীর ভুল ব্যাখ্যার কারণে নেওয়া ভুল নীতি, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে শত্রুকে খাটো করে দেখার প্রবণতা, কিছু অভ্যন্তরীণ কারণ এবং অনেক বহিঃষড়যন্ত্রকে রুখতে না পারা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ধারাবাহিক সামাজিক বিপ্লবের কাজে অবহেলা (সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য যা অবশ্য কর্তব্য) ইত্যাদি কারণে ইতিহাস হয়ে গেল আশা-আকাঙ্খার সোভিয়েত ইউনিয়ন।

২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১... শেষবারের মতো ক্রেমলিনের ওপর থেকে নামিয়ে আনা হলো কাস্তে হাতুড়ি খচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের রক্ত পতাকা, পরিবর্তে তোলা হলো ত্রিবর্ণ রঞ্জিত 'রাশিয়া'র নতুন জাতীয় পতাকা। তবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক অতি উন্নত এক দেশের অবলুপ্তি ঘটলেও সাবেক সোভিয়েতের যে অনুপ্রেরণায় দুনিয়াজোড়া মেহনতি মানুষ 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা এখনও সেই একই প্রেরণা আর ভরসায় সে গান গেয়ে চলেছেন। তাঁদের কণ্ঠ থেকে সে গান কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। সোভিয়েত আদর্শকে রক্ষা করতে গিয়ে, মানব সভ্যতাকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যাঁরা সে সময়ে ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরা তো বটেই,এমনকি সচেতন যাঁরা সাবেক সোভিয়েতের কিছুটাও দেখেছেন, তাঁরাও এখনও সোভিয়েত আদর্শকে সম্মান করতে বাধ্য হন, কারণ তাঁরা জানেন যে আর যাই হোক আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের বুনে দেওয়া পেপসি সংস্কৃতি বর্তমান প্রজন্মকে কোনও মূল্যবোধ দিতে পারেনা। তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে সমাজতন্ত্র মানেই শুধু শ্রমিক কলোনী, গুপ্তচর লেলিয়ে দেওয়া কিম্বা লৌহ যবনিকা নয়, সমাজতন্ত্র মানে হল আসলে একটা উজ্জ্বল পৃথিবী, যেখানে সমস্ত কিছুই সমান ভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়, দুর্বলদের পাশে সব সময়ে দাঁড়ানোটাই রীতি হয়, সর্বত্র সহমর্মীতার পরিবেশ বিরাজ করে। সমাজতন্ত্র সব কিছুকে 'দখল' করা শেখায় না, সমাজতন্ত্র অন্যের জন্যে অনুভব করতে শেখায়। সে বলে, ''তোমার যদি গাড়ি না থাকে, তাহলে দেশে কারুরই গাড়ি থাকবে না—থাকলে সবারই এক সাথে থাকবে''। সোভিয়েত এটাই বাস্তব করে দেখিয়েছিল। সেখানকার নেতারাও সেটাই করতেন। যতদিন দেশের সব মানুষের টমেটো কেনার ক্ষমতা হয়নি, লেনিন নিজে টমেটো খাননি।

আজকের পৃথিবীর দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে যে আদর্শ এবং মূল্যবোধ রুশ বিপ্লবের চালিকা শক্তি ছিল, তাকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হবে। আজকের পৃথিবী যুদ্ধ, হানাহানি আর অসাম্যে দীর্ণ। সোভিয়েতের বিকল্প রাজনীতি যে আসলে মুনাফা আর স্বপ্নভঙ্গের রাজনীতি, তা ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এখন আর কোথাও রাজনৈতিক উপনিবেশ নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে এটা প্রমাণিত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের এবং বামপন্থী আন্দোলনগুলির প্রবল চাপ না থাকলে এটা সম্ভব হতো না। সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকা আর না থাকাটার মধ্যে কী তফাত, সেটা বুঝতে গেলে ১৯৯১ পরবর্তী ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পরিস্থিতির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতিকে তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যাচ্ছে মাত্র আটটা পরিবার গোটা পৃথিবীর অর্ধেক ধন-সম্পত্তির মালিক বনে গেছে। টমাস পিকেট্টি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল ইন দি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি'তে বিস্তারিত ভাবে দেখিয়েছেন যে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ এবং আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান অসাম্য বিরাজ করতো, যা ১৯৩০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করে। এই সময়টা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বর্ণযুগ। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর ঐ সময়েই শ্রমিক এবং বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক বিপ্লবের পর সম্ভাব্য অন্য বিপ্লব বা বিপ্লবগুলিকে রুখে দেওয়ার তাগিদেই শাসক শ্রেণি সে সময়ে বাধ্য হয়েছিল তাদের লালসায় বাঁধ দিতে, বিভিন্ন কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। রুশ বিপ্লব না হলে এবং সমাজতন্ত্র কায়েম হওয়ার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেহারা চোখের সামনে না দেখা গেলে এবং তার অনুপ্রেরনায় অন্যান্য দেশের মানুষ বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পড়লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলির শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মানের হঠাৎ এবং দ্রুত উন্নয়নে বাধ্য থাকতো না সে সব দেশের সরকারগুলি। উন্নত হতো না তাদের এবং সে সব দেশের প্রান্তিক মানুষগুলির শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনের অন্যান্য মৌলিক দিকগুলি। ১৯৩০ সালে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট সামাজিক উন্নয়নের যে দলিল তৈরি করেছিলেন, ১৯৫০-৬০ কালপর্বে গ্রেট ব্রিটেন এবং জার্মানীতে যে সামাজিক সংস্কারগুলি দেখা গিয়েছিল কিম্বা ফ্রান্সে চার্লস দ্য গল যে সংস্কারের ডাক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেগুলির কিছুই হতো না রুশ বিপ্লব এবং তার অনুসারী বামপন্থী আন্দোলনের চাপ না থাকলে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকাকালীন শাসক শ্রেণি 'কমিউনিজমের ভূত'-এর তাড়ায় যে সমস্ত কল্যাণকর সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, সোভিয়েতের থেকে মুক্তি পাওয়ার ফলে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির কবলে পড়ে সে সবগুলিই এখন উধাও হতে চলেছে। ফলে আমেরিকা এবং পশ্চিমী দেশগুলিতে এখন সম্পত্তির অসাম্য তীব্র, সামাজিক মেরুকরণ তীব্রতর। দুনিয়া জুড়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়ে চলার ফলে দেশে দেশে রক্তাক্ত অভ্যুত্থান, হানাহানি এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এখন নৈমিত্তিক ঘটনা। শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জগতে নেমে এসেছে এক বিরাট অবক্ষয়। সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বেশ কিছু দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দল, যারা এক সময়ে সে সব দেশে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিত, তারা উঠে যাওয়া বা অন্য রাজনৈতিক দলের সাথে মিশে যাওয়ার ফলে ধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইতেও এখন সাংঘাতিক ভাবে ঘাটতি। ফলে নির্বিচারে মিডিয়া এবং কারিগরী বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির মানুষ মানবতার স্বপক্ষে কাজের পরিবর্তে তার বিপরীতে কাজ করে যেতে পারছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়—প্রথমত, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব পৃথিবীতে সমস্ত ধরনের প্রগতিকে সাহায্য করেছিল, উপনিবেশবাদ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করেছিল, পূর্ব গোলার্ধকে উজ্জিবীত করে ভারত এবং চীন সহ বিভিন্ন সার্বভৌম দেশ গঠনের রাস্তা খুলে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে, আজকের চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, নিকারাগুয়া সহ অনেকগুলি দেশই রুশ বিপ্লবের সরাসরি উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয়ত, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে আরব্ধ হলেও রাশিয়ার বিপ্লব শুধুমাত্র উন্নয়নশীল এবং সাবেক ঔপনিবেশিকতা দেশগুলিরই নয়, এমনকি পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডকেও এগিয়ে দিয়েছিল। তৃতীয়ত, একমাত্র বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রচণ্ড মানবিক সম্ভাবনা এবং আন্তর্জাতিকতার আদর্শবোধই গোটা মানব সভ্যতার চরম বিপদ নাজি বাহিনীকে সফল ভাবে এবং সার্থক ভাবে রুখে দিয়ে গোটা পৃথিবীকেই বাঁচিয়ে দিয়েছিল। দুঃখের কথা হল, এখন নতুন চেহারায়, নতুন ভাবে ফের ফিরে ফিরে আসছে সেই বিপগুলিই, যেগুলির সামনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঢাল হয়ে মানুষকে রক্ষা করেছিল।

বোঝা যাচ্ছে সোভিয়েতের অনুপস্থিতিতে এখন শোষণ আর অসাম্যের পরিমাণ ঠিক কতোটা? চেষ্টা করছি সাহায্য করতে। ধরা যাক গোটা পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা ১০০ আর তাঁরা সবাই একটাই গ্রামে থাকেন। তাহলে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সেই গ্রামের চেহারাটা দাঁড়াবে এইরকম—

- ঐ গ্রামে বাস করবেন ৬১ জন এশিয়, ১৩ জন আফ্রিকান, ১২ জন ইউরোপীয়, ৯ জন লাতিন আমেরিকার আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মিলিয়ে ৫ জন।
- সেখানে পুরুষ থাকবেন ৫০ জন, মহিলাও ৫০ জন।
- ৭৫ জন হবেন অ-শেতাঙ্গ, শেতাঙ্গ ২৫।
- জাতি নির্বিশেষে ৮০ জন বাধ্য হবেন নিম্ন মানের আবাসন গ্রহণ করতে।
- জাতি নির্বিশেষে পড়া বা লেখার ক্ষমতা থাকবে না ১৬ জনের।
- জাতি নির্বিশেষে অপুষ্টির শিকার হবেন ৫০ জন, যাঁদের ১ জন অন্ততঃ মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।
- জাতি নির্বিশেষে ৩৩ জন পরিশোধিত পানীয় জল পাবেন না।
- আধুনিক শৌচাগার পাবেন না জাতি নির্বিশেষে ৩৯ জন।
- জাতি নির্বিশেষে ২৪ জনের জন্য কোনও বিদ্যুৎ সংযোগ থাকবে না, বাকি ৭৬ জনের বেশির ভাগই বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন শুধুমাত্র রাত্রে আলো জ্বালার জন্যে।
- ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে জাতি নির্বিশেষে মাত্র ৮ জনের।
- মাত্র ১ জন পাবেন কলেজে পড়ার সুযোগ।
- ১ জন হবেন এইড্‌সের শিকার।
- আসন্ন-প্রসবা হবেন ২ জন, মৃত্যুমুখে থাকবেন ১ জন।
- জাতি নির্বিশেষে ৪৮ জনের রোজগার হবে দৈনিক ২ ডলারের কম।
- জাতি নির্বিশেষে ২০ জন বাধ্য হবেন দৈনিক ১ ডলারেরও কম রোজগারে জীবন ধারণ করতে।
- ৫ জন পৃথিবীর ৩২ শতাংশ সম্পত্তির অধিকারী থাকবেন, যাঁদের সবাইই হবেন আমেরিকান।

এবারে বোঝা গেল, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে কাদের লাভ হয়েছে আর কাদের ক্ষতি? বোঝা গেল, কেন মানুষ এখনও 'ইন্টারন্যাশনাল' গায়, কেন এখনও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে আর কেন মানুষ মনে করে আগের পৃথিবীটাই ভালো ছিল? অবশ্যই নয়া- উদারবাদের প্রবক্তা এবং তার গোমস্তারা এটা মনে করে না। তারা পুরানো রাশিয়া সম্পর্কে নানা ভীতিকর প্রচার করে, ঠিক যেমন করছে এখনকার চীনের বিরুদ্ধে, কিন্তু সমাজতন্ত্রের কথা, তার আদর্শের কথা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা বেমালুম চেপে যায়। তারা এখনকার অর্থনীতির রঙ্গীন স্বপ্ন দেখাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাই দিয়ে গরীব মানুষের পেট ভরাতে পারেনা। আমাদের ভারতবর্ষও এর বাইরে নয়। এখানেও শোষণ আর নিপীড়ন চরমে। এখানেও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য চরমে। এখানেও দৈনিক ২০

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

আসন্ন জাতীয় কাউন্সিল সভার প্রেক্ষাপট

দেবব্রত রায়
যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আসন্ন জাতীয় কাউন্সিল সভা আগামী ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ কলকাতার লবণ হ্রদ অঞ্চলের ই জেড সি সি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সংগঠনের গঠনপর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং আজও আছে। সেদিক থেকে বর্তমান অবস্থায় এই সংগঠনের জাতীয় কাউন্সিল সভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সুযোগে পুরোনো ইতিহাসকে কিঞ্চিত ঝালিয়ে নিলে আমদের আজকের সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি বুঝতে সুবিধা হবে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন ক্রমশ গতিপ্রাপ্ত হতে থাকে। পাশাপাশি অন্যান্য অংশের কর্মচারীদের আন্দোলনও গতি পেতে থাকে। পঞ্চাশের দশকে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীদের ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। প্রশাসন ও প্রশাসনের দালাল ক্ষুদ্র এক অংশের কর্মচারীদের বিভেদপন্থাকে পরাজিত করে ব্যাপক অংশের কর্মচারীদের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের নতুন দিশা দেখাতে শুরু করে। সেই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিমবঙ্গে যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা শুরু হয়। খাদ্য দপ্তরে ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদায়ী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতি তাঁদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক, ব্যাঙ্ক, ইনসিউরেন্স ও মার্কেনটাইল প্রভৃতি তৎকালীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং বিকল্প চাকরির জন্য একটি যৌথ কমিটি গঠন করে। সরকারের সাথে আলোচনার পাশাপাশি কমিটির অভিজ্ঞ নেতৃত্বের পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হতে থাকে। অপর পদক্ষেপটি হলো অরবিন্দ ঘোষের (বর্তমান বছরটি তাঁর জন্মশতবর্ষ হিসেবে পালিত হচ্ছে) অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্বকে নিয়ে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশন থেকে 'ছাঁটাই রুখতে হবে'—এই স্লোগানের ভিত্তিতে সারা ভারতের রাজ্যগুলির খাদ্য বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ে 'দ্য ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইজ এমপ্লয়িজ ইন্টার স্টেট সংঘ' নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলা হয়। কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ছিলেন বিমান মিত্র ও আরবিন্দ ঘোষ। এই কনভেনশনটি তৎকালীন সময়ে খুবই কার্যকরী হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীরা খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে অসম বিকাশের জন্য সেই সময় এই সংগঠনটি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীরা সেদিন এই উদ্যোগের মধ্যে সর্বভারতীয় আন্দোলনের একটি রূপরেখা দেখতে পেয়েছিলেন। এবং নিশ্চিত বলা যায় যে পরবর্তীকালে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন গঠনের ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষের এই অভিজ্ঞতা দারুণভাবে সাহায্য করেছিল। সেই ছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন গড়ে তোলার সলতে পাকানোর শুরু ।

অবশ্য সর্বভারতীয় ফেডারেশন গড়ে উঠতে আরও প্রায় একটি দশক লেগে গিয়েছিল। প্রথমে ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস, সুলভ মূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ ইত্যাদি সর্বজনীন দাবি নিয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত হয় আন্দোলনকে আরও সম্প্রসারিত করার প্রথম ধাপ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার। পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন ও তার উপর রাজ্য সরকারগুলির তীব্র আক্রমণ, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিকারে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্নে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ঐক্য ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা থেকে ১৯৬০ সালে হায়দ্রাবাদ শহরে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন গঠিত হয়। যদিও তাকে প্রাণবন্ত ও সক্রিয় রূপ দেওয়া হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আহূত ১১-১৩ জুন ১৯৬৫ সালে কলকাতার সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভা থেকে। কার্যত সেই প্রতিনিধি সভার সিদ্ধান্ত থেকেই শুরু হয় সারা ভারত সংগঠনের পরিচালনায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় আন্দোলন। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামরত মানুষকে বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়ে উজ্জীবিত এই রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মীরা জঙ্গী আন্দোলনের এক উন্নত পর্যায়ে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সরকারের সকল চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে গণছুটির মতো কর্মসূচি প্রতিপালন করে। তবে এইবারের সর্বভারতীয় কাউন্সিল সভা এক সম্পূর্ণ ভিন্নতর মাত্রা নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার জনগণের অর্থনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল যদিও জনগণের আন্দোলনের চাপে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, ব্যাঙ্ক, বিমা, ক্ষেত্রের রাষ্ট্রায়াত্তকরণের মতো কাজ কিছুটা হলেও দেশের আর্থিক স্বনির্ভরতাকে সুদৃঢ় করেছিল। কিন্তু দেশ ও রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস সরকারের নানা জনবিরোধী নীতি জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। একের পর এক বাজেটে দেশের সরকার মূলত ধনিক ও একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করে গেছে। এই শ্রেণির জন্য বিপুল কর ছাড় অথচ বিপুল

ই জেড সি সি, এখানেই অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় কাউন্সিল সভা

সংখ্যক জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির চাপে নাজেহাল জনগণ মাঝেমাঝেই গণ আন্দোলনে ফেটে পড়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যে ঘটেছিল ঐতিহাসিক শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের আন্দোলন। ষাটের দশকে এই রাজ্যের খাদ্য আন্দোলন রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেস সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য রাজ্যেও কংগ্রেস দলের ভিত্তি আলগা হতে শুরু করেছিল। ক্রমশ বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস শাসনে আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ায় সেখানকার আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। শুরু হয় রাজ্যে রাজ্যে অকংগ্রেসি সরকার গঠনের প্রক্রিয়া। আবার কংগ্রেস দলের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জন বিক্ষোভের সেই সুযোগেই বিভিন্ন রাজ্যে ও দেশে চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিও ধীরে ধীরে নিজেদের শক্তি সংহত করতে থাকে।

গত শতাব্দীর শেষের দশকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্বের শ্রেণিশক্তির ভারসাম্যের এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। একমুখী বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ফলে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ অনুগামী হয়ে ওঠে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ আদর্শ থেকে সরে এসে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ করে মার্কিন সম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক, সামরিক কৌশলগত অংশীদার হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শুরু হলো নয়া উদার অর্থনীতির যুগ। ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারী ক্ষেত্রকে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া শুরু হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক, বিমা, প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রেল, বিমান বন্দর, খনি সমস্ত কিছুর শেয়ার দেশি-বিদেশী সংস্থাকে বেচে দেওয়া হচ্ছে। এমনকী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো নির্মান প্রভৃতি পরিষেবা ক্ষেত্রকেও বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ফলত এই ধরণের সমস্ত পরিষেবা জনগণকে চড়া অর্থের বিনিময়ে পেতে হয়। উদার অর্থনীতির পরিণামে বেড়েছে মূল্যবৃদ্ধি ও ভয়াবহ বেকারি। মাত্র তিন বছর আগে কোভিড অতিমারি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পুঁজিবাদী দেশগুলির স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কঙ্কালসার চেহারা।

এই রাজ্যে আমরা শ্রমিক কর্মচারীরা ৩৪ বছরের জন্য পেয়েছিলাম শ্রমজীবী মানুষের পক্ষের বামফ্রন্ট সরকারকে। দ্বিধাহীন ভাষায় আমরা বলতে পারি, সর্বদা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে থাকা এমন সরকার অতীতে আমরা কখনও দেখিনি। গরীব কৃষক পেয়েছিল জমির অধিকার, শ্রমিকরা পেয়েছিল ধর্মঘট সহ ন্যায্য অধিকার। শ্রমিক, মালিক, সরকারের ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় সরকার সর্বদা থাকত শ্রমিকের পক্ষে। সরকারী, আধা সরকারী বা সরকার পোষিত কর্মচারীরা প্রথম পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা সহ আরও অসংখ্য পেশাগত অধিকার; পেয়েছিলেন ধর্মঘটের অধিকার। চার-চারটি পেকমিশনের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীরা দেখেছিলেন বেশ কিছুটা স্বচ্ছলতার মুখ। অথচ গত ১২ বছরে তৃণমূল সরকারের শাসনে শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারীদের অর্জিত সেই সব অধিকার এক এক করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে একটা অসম লড়াই জারি রেখেছিল। দেশের একটি অঙ্গরাজ্যের পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত কঠিন লড়াই। তবু গরীব মানুষকে কিছুটা স্বস্তিতে রাখতে সেই লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছিল বামফ্রন্ট সরকার । গোটা দেশে উদার অর্থনীতির চাপে যখন সরকারী ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ কমে যাচ্ছে তখনও এই রাজ্যে সরকারী চাকরির দরজা খোলা রাখা হয়েছিল। পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতি বছর লোক নিয়োগ হয়েছে। তাতেই কর্পোরেট দুনিয়া ক্ষেপে উঠেছিল বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। শুরু হয়েছিল নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পাঁচ বছরে সাম্রাজ্যবাদের সুতোর টানে সমস্ত বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক শক্তি সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বিকল্পে তৃণমূলের যে সরকার এলো। তারা প্রথম থেকেই উদার অর্থনীতির সমস্ত নীতিকেই সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বর্তমান বিজেপি সরকারের অনেক আগেই রাজ্যের তৃণমূল সরকার কর্পোরেটের স্বার্থে বিধানসভায় কৃষি আইন পাশ করেছিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকের জমির পাট্টা কেড়ে নিচ্ছে তৃণমূলের ঝাটিকা বাহিনী। কারখানায় কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনকে ভাঙতে মালিকদের দালালের ভূমিকা গ্রহণ করছে তৃণমূলের বাহিনী। শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙতে বর্তমান সরকার মুখিয়ে আছে। সরকারী কর্মচারীদের নিয়মিত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা গত ১২ বছরে হারিয়ে গেছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে ধর্মঘটের অধিকার। ধর্মঘট করলে কর্মচারীদের ডায়াস-নন করে চাকরি জীবন থেকে ধর্মঘটের দিনটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। কেটে নেওয়া হচ্ছে ধর্মঘটের দিনের বেতন। দুর্নীতির চরম পাঁকে নেমেছে এই রাজ্যের বর্তমান সরকার। উদার অর্থনীতি একই সঙ্গে ডেকে আনে উৎপাদন শূন্য লুঠেরা পুঁজিকে। তার হাত ধরেই আসে দুর্নীতি। স্বাধীন ভারতে বা এই রাজ্যে দুর্নীতি কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার দুর্নীতির সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শুরু হয়েছিল সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি দিয়ে, তারপর এক এক করে গরু পাচার, কয়লা, বালি খাদান থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ আর এখন সব দুর্নীতিকে ছাড়িয়ে গেছে রেশন কেলেঙ্কারি। তৃণমূলের আমলে একের পর এক প্রতিটি দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে ও গ্রেপ্তার হয়েছে তৃণমূলের বড়ো নেতা অথবা মন্ত্রীসভার সদস্যরা।

তবে শুধু এই রাজ্যে নয় গোটা দেশের ছবিটা আরও ভয়াবহ। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেটের সরকার। এবং বাছাই করা কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যস্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কৃষি থেকে পরিষেবা, ব্যাঙ্ক, বিমা, রেল, বন্দর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কিছুরই মালিকানার সিংহভাগ এখন দেশি বিদেশী কর্পোরেটের হাতে। সারা দেশ জেনে গেছে এই সরকার আদানি-আম্বানিদের সরকার। এই দুই কর্পোরেট সংস্থা সহ অন্যান্যরা একদিকে যখন আর্থিক সম্পদ বাড়িয়ে চলেছে তখন ক্ষুধার সূচকে ভারতবর্ষের মতো বড়ো দেশ ক্রমশ নীচে নামছে। বেকারি, মূল্যবৃদ্ধিতে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের উপরে সবচেয়ে বড়ো আক্রমণ হলো নয়া পেনশন প্রকল্প। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন প্রথম থেকেই এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে এসেছে। এবং তাদের আন্দোলনের চাপে বেশ কিছু অবিজেপি রাজ্য সরকার নয়া পেনশন প্রকল্প রদ করে পুরোনো পেনশন ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনেছে।

অন্যদিকে বিজেপি সরকারের পেছনে রয়েছে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনগুলি যাদের একটিই লক্ষ্য ভারতবর্ষে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে থাকতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই সঙ্ঘ পরিবারের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। ছড়ানো হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে নানা ভিত্তিহীন ঘৃণা সৃষ্টিকারী বক্তব্য। ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে ঘৃণা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম উদাহরণ হলো কাশ্মীর ও মণিপুর। কাশ্মীরে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘুদের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেবার জন্যই আইন পাশ করেনি, এই রাজ্যের নির্বাচিত বিধানসভাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গত তিন বছরে সেই বিধানসভার নির্বাচন হয়নি। প্রসঙ্গত সম্প্রতি সেখানে লে-লাদাখ অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসনের নির্বাচনে বিজেপি পর্যুদস্ত হয়েছে। মণিপুরে বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে মেইতেই ও কুকি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়াবহ ও বীভৎস দাঙ্গা চলছে আজ তিন মাস ধরে। প্রথম দু'মাস প্রতিদিন দাঙ্গায় মানুষ খুন হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছেন মহিলারা। দেশের প্রধানমন্ত্রী আজও সংসদ কিংবা সংসদের বাইরে এই নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও পাশের রাজ্য মিজোরামে নির্বাচনী প্রচারে গেছেন কিন্তু মণিপুরে যাননি। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিজেপি

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

ওয়েষ্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের ১১ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচী

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের চরিত্র চিরকালের জন্য স্থায়ী হয় না। পাশাপাশি ব্যক্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কোনো সংগঠনেরই পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে না। পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা পরিস্থিতিকে ভেদ করার মতো দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণে সৃজনশীল ও চেতনাদৃপ্ত সংগঠন গড়ে তুলতে হয়।

এই নিরিখেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতি ওয়েষ্টবেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন গত ৮ ডিসেম্বর '২০২৩, কলকাতার মৌলালী মোড় সংলগ্ন মৌলালি মাজারের পাশে বেলা ১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সমিতির কেন্দ্রীয়ভাবে একটি জমায়েতের আয়োজন করেছিল ১১ দফা দাবিতে। ঐদিন বেলা পৌনে ১টায় সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর 'প্রীতি ভবন'-এর নীচ থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল জমায়েত স্থলে উপস্থিত হয়। সভার প্রথমেই সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা গণসঙ্গীত পরিবেশন করে। পরবর্তীতে সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত, সীমা সাহা ও দুর্গা রায়কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠন করে ও তাঁরা সভা পরিচালনা করেন।

প্রথমেই প্রস্তাব পাঠ সহ প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতমা যুগ্ম সম্পাদিকা কুমকুম মিত্র। প্রস্তাবের সবর্থনে বক্তব্য পেশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতি সহ সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্যের আগে সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী মধুজা সেন রায়। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদিকা কুমকুম মিত্র। পরবর্তীতে তিনি সংগঠন ও লড়াই আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

এই সভায় ১১ জন Male Nurse সহ মোট ১৭৯ জন কর্মচারী বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল থেকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধি সহ সভায় প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভানেত্রী সীমা সাহা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি বক্তব্যর মধ্য দিয়ে সভা শেষ করেন। □

কুমকুম মিত্র

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

এখনও প্রাসঙ্গিক, এখনও প্রয়োজন

টাকার কম রোজগার করেন ৮০ শতাংশ মানুষ। এখানেও দেশের অর্ধাংশের বেশি সম্পদের অধিকারী মাত্র পাঁচটি পরিবার। এখানেও শোষক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক ক্ষমতাসীন নেতারা। এখানেও মানবতা আজ চরম বিপন্ন।

তাহলে পাঠক, বুঝতে পারছেন কি ইন্টারন্যাশনালের প্রাসঙ্গিকতা? যদি সত্যিই বুঝতে না পারেন তাহলে কল্পনা করুন আপনি ১৯১৬ সালের রাশিয়ার একজন কৃষক রমণী। আপনি দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে জমিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ গ্রামের সব পুরুষকেই বাধ্য করা হয়েছে যুদ্ধে চলে যেতে। আপনার সাথে বাকি মহিলারা মিলেও পারছেন না জমির ফসল রক্ষা করতে। কল্পনা করুন সুদূর পেট্রোগ্রাডে আপনার কোনও ভগ্নি-কন্যা বা ভ্রাতুষ্পুত্রী সকালে কারখানায় কাজের আগে সামান্য রুটি যোগাড়ের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন, তাও এমন খাদ্য যোগাড় করতে পারছেন না যা দিয়ে পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায়। তাঁর ভাণ্ডারে এমন জ্বালানীটুকুও নেই, যা দিয়ে দারুণ শীতে ভাঙা ঘরটুকুও গরম করা যায়। কল্পনা করুন আপনি খবর পাচ্ছেন যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার স্বামী অথবা পুত্র এখনও বেঁচে থেকে লড়াই করছেন, কিন্তু তাঁদের গোলা-বারুদ ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছেন এবং এক সময়ে তাঁদের বাধ্য করা হচ্ছে খালি হাতেই যুদ্ধ করে যেতে। কল্পনা করুন এই ভাবেই আপনার ষোলো কেটে সতের সাল এলো, এলো প্রচণ্ড ঠান্ডা। এবারে কল্পনা করুন এক সময়ে হঠাৎ খবর এলো আপনার যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল 'জার' নিহত হয়েছে এবং আঠারো সালে খবর পেলেন সব কিছু বদলে দিয়ে রাশিয়ায় এক নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটেছে, যিনি ক্ষমতায় এসে শুধুমাত্র শান্তির কথাই বলছেন না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনার ঘরের মানুষগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন, আপনার সমস্ত বুনিয়াদি চাহিদা মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং তাকে বাস্তবায়িত করা শুরু করে দিয়েছেন। এই নতুন নেতা এবং রাষ্ট্রপ্রধান, যাঁর নাম ভ্লাদিমির লেনিন, বলছেন কতিপয় উচ্চবিত্ত মানুষের হাতে নয়, শাসন ক্ষমতা থাকবে গরীব, খেটে খাওয়া মানুষের হাতে। ব্যক্তি মালিকানা ঘুচিয়ে দিয়ে দেশের সম্পত্তির সমান অধিকার পাবে সব মানুষ। সব মানুষের নাগরিক অধিকার হবে সমান। প্রতি মানুষের হাতে কাজ থাকবে। সবার থাকবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বাসস্থানের অধিকার এবং সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে রাষ্ট্র নিজে। কল্পনা করুন আপনি দেখছেন এতোদিন পরে এগুলো শুধু বলাই হচ্ছে না, বাস্তবেও হচ্ছে! গোটা পৃথিবীর মানুষ যা কল্পনাও করতে পারতেন না, রাশিয়ায় এখন সেটা বাস্তব!

এবারে কল্পনা করুন সত্যি সত্যিই ওই সময়ে রাশিয়ার একজন কৃষক-পত্নীর ঠিক কতটা আনন্দ হয়েছিল। পাঠক, আপনার এখনকার পরিস্থিতি ১৯১৬ সালের ওই কৃষক রমণীর থেকে কিছুমাত্র আলাদা নয়। প্রেক্ষিত ভিন্ন, কিন্তু পরিস্থিতি একই। ১৯১৬ থেকে এবারে কল্পনা করুন আপনি নিজেই ওই ১৯১৮-এ পৌঁছে যাওয়া কৃষক-পত্নী। এবারে অনুভব করতে পারবেন আপনার আনন্দ এবং অনাগত সেই আনন্দলাভের গভীর ইচ্ছাতে অজান্তেই আপনার ঠোঁটে চলে আসবে এখনও প্রাসঙ্গিক অমর সেই গান ''জাগো জাগো, জাগো সর্বহারা/ অনশন বন্দী ক্রীতদাস... '', ইন্টারন্যাশনাল যার নাম। আমি নিশ্চিত, এবারে আপনি আপনার কর্তব্য বুঝতে পেরেছেন। তাহলে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ুন মুক্তির পথ করে দিতে... আপনার মতো করে... আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

আসন্ন জাতীয় কাউন্সিল সভার প্রেক্ষাপট

সরকারের আমলে এইসব কিছুই একেবারে লাগামছাড়া হয়ে গেছে। এর ফলে জনগণের বিপুল অংশের মধ্যে নিজেদের জীবনজীবিকার লড়াইয়ের প্রশ্ন একেবারে পেছনের সারিতে চলে গিয়ে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজনের প্রশ্ন। লোকসভা নির্বাচনের আগে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি যখন চরমে তখন বিজেপির প্রধান নির্বাচনী ইস্যু হচ্ছে অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা নির্মাণ কোনো সরকারের কাজ হতে পারে না। দেশের মানুষ বেকারি ও মূল্যবৃদ্ধিতে যখন নাজেহাল তখন সরকার নাগরিকত্ব আইন এনে গরীব মানুষকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সংসদে বামপন্থীদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় শ্রমিক, কর্মচারীদের পক্ষে বলার লোক কমে গেছে। দেশের সংসদে সাংসদদের আলোচনা, বিতর্কের সময় কমানো হচ্ছে, স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতিতে কোনো আলোচনা ছাড়াই সংসদে নানা জনবিরোধী আইন পাশ করা হচ্ছে। আর সেই আইনের বিরোধিতা করলে সংবাদমাধ্যম থেকে ব্যক্তি বিশেষকে ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সাংবিধানিক সমস্ত সংস্থাগুলিকে দখল করে বিজেপি দল ও সরকার এক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার থেকে বিজেপি দল ও সরকারের প্রধান বিচার্য বিষয় রামমন্দির নির্মান। ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি এই রামমন্দির প্রতিষ্ঠা দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হতে চেষ্টা করছে।

অতএব, নিজেদের জীবনজীবিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে আসলে শক্তিশালী করতে হবে কর্পোরেট হিন্দুত্বের এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে না পারলে আর্থিক ও পেশাগত কোনো আন্দোলনে জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব হবে না। জনগণের বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। কৃষকদের দিল্লি সহ উত্তর ভারতের নানা প্রান্তে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে এই চরম স্বৈরাচারী সরকার তাঁদের করা কৃষি আইন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখজনক বিষয় হলো বহু রাজ্যে আন্দোলনের চাপে আবার পুরোনো পেনশন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে রাজ্যের সরকারগুলি বাধ্য হয়েছে। অতএব এটা পরিষ্কার যে আন্দোলনের চাপে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির লৌহ পুরুষের সরকারকেও আইন বদলে বাধ্য করা যায়। প্রসঙ্গত বলা ভালো এই রাজ্যের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আন্দোলন নতুন নতুন গতি পাচ্ছে। এই বছরের প্রথম দিকে সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার ও অন্যান্য জরুরি দাবিতে আন্দোলন গত ১০ মার্চ সফল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছিল। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা গেল জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সামনে শাসকদলের মস্তান বাহিনী ও তাদের রক্ষকর্তা পুলিশও বহু জায়গায় পিছু হটেছে। সম্প্রতি ছাত্র যুবদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শহরব্যাপী ইনসাফ পদযাত্রা বিভিন্ন জায়গায় সাড়া ফেলেছে। আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে কেন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী এই স্বৈরাচারী কর্পোরেট সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশের রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এই সব রাজনৈতিক দলের সবার নীতিগত আবস্থান হয়তো সমান নয়। তবুও ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী কেন্দ্রের এই সরকারকে গদিচ্যুত করতে বিভিন্ন রাজ্যে তাঁরা এক মঞ্চে সমবেত হয়েছে। কারণ তারা সকলেই অনুভব করছে যে আর এস এস পরিচালিত ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে দেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যাবে না। উদার অর্থনীতির পাশাপাশি ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টিকারী এই সরকারের পতন ঘটাতে না পারলে আগামীদিনে ভারতবর্ষের মানুষের পক্ষে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে উঠবে।

আগামী দিনে এই আর্থিক উদারনীতির প্রবল গতিকে দুর্বল করতে পারলে এই রাজ্যের অপদার্থ ও স্বৈরাচারী সরকারকে সহজেই দুর্বল করা যাবে। তাই জনগণের বিভিন্ন অংশের আন্দোলনের পাশাপাশি ব্যাপক অংশের কর্মচারী সমাজকে আবৃত করে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে সর্বভারতীয় সংগঠনের জাতীয় কাউন্সিল সভা অবশ্যই একটি বড়ো ভূমিকা নেবে। □

রেশন দুর্নীতি

বিদ্যুৎ দাস

রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রেশন দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গত ২৬ অক্টোবর, ২০২৩ গ্রেপ্তার হন। তিনি হলেন তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি রাজ্যের মন্ত্রী থাকা অবস্থায় গ্রেপ্তার হলেন।

গত এক দশকের বেশি সময়ে পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির আতুরঘরে পরিণত হয়েছে। নারদা, সারদা, রোজভ্যালী, গোরু পাচার, একশো দিনের কাজের দুর্নীতি, আবাস দুর্নীতি, কয়লা পাচার, সোনা পাচার, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। দুর্নীতি ও লুঠতরাজের একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়েছে রাজ্যে। এই বাস্তুতন্ত্রে কাজ করছে দুর্নীতির সিন্ডিকেট আর এই সিন্ডিকেটের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, পৌর, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত শাসকদলের প্রতিনিধিরা, পুলিশ অফিসার থেকে বিভিন্ন স্তরের আমলা এবং শাসকদলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা। রেশন দুর্নীতিও এই দুর্নীতির বাস্তুতন্ত্রেরই অংশ।

শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতির পরে ইডি রেশন দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমে দুর্নীতিতে জড়িত সন্দেহে চাল ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। ইডি ও রাজ্য পুলিশ সূত্রে রেশন দুর্নীতিতে অভিযোগগুলি হল—কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায্য মূল্যের রেশন সামগ্রী খোলাবাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা লুট করা হয়েছে, রাজ্য পুলিশ রেশন দুর্নীতি চক্রের মূল পাণ্ডা বাকিবুর রহমান সহ একাধিক রেশন ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে তিনটি মামলা করে, একাধিক মন্ত্রী ও প্রভাবশালীর বরাভয়ে একশ্রেণির ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়ে সিন্ডিকেট তৈরি করা হয়, দুর্নীতির টাকা নামে-বেনামে জমি, হোটেল ও পানশালায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। বাকিবুর রহমানের পারিবারিক সদস্যদের নামে সম্পত্তিতে দুর্নীতির টাকা বিনিয়োগের অভিযোগ, নামে বেনামে বাকিবুরের কয়েকশো বিঘা জমির হদিস, টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ বাকিবুরের বিরুদ্ধে, বাকিবুরের একাধিক বিদেশী গাড়ি, চালকল এবং আটাকলের হদিস, রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে হোটেলের জমি অধিগ্রহণের অভিযোগ বাকিবুরের বিরুদ্ধে। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রী মানি লন্ডারিং টাকা নয়-ছয়ের অভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেছেন যেমন ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়করা করেছেন।

অভিন্ন কৌশলটি হল, ভুয়ো সংস্থা তৈরি করে সেখানে নিজের পরিবারের সদস্যদের এবং ঘনিষ্ঠদের পরিচালকরা এবং কাগজে কলমে অস্তিত্ব থাকা সেই সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ টাকা অন্যত্র পাচার করা। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী যেমন জামাই ও ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর নামে, তথাকথিত বীরভূমের বাঘ যেমন তাঁর বাড়ির পরিচারক ও নিজের কন্যার নামে, বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য যেমন নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে ভুয়ো সংস্থার পরিচালক পদে বসিয়ে টাকা পাচার করেছেন, সেই কৌশলেই প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং বাড়ির পরিচারককে ভুঁয়ো সংস্থার পরিচালক করে সেই কোম্পানির মাধ্যমে রেশনে চাল আটা খোলা বাজারে বিক্রির বিপুল পরিমাণ কালো টাকা সাদা করেছেন। ইডির জেরায় মন্ত্রী জানিয়েছেন তাঁর নির্দেশেই তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তিনটি সংস্থার পরিচালক হয়েছিলেন। সেই সংস্থায় এখন পরিচালক তাঁর বাড়ির পরিচারক এবং কৃষি দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক কর্মী রামস্বরূপ শর্মা। সেই তিনটি সংস্থা হল—শ্রীহনুমান রিয়েলকন প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রেসিয়াস ইনোভেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড এবং গ্রেসিয়াস ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড। শ্রী শর্মা জানিয়েছেন, তাঁকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মন্ত্রীর লোকেরা সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি জানতেনই না যে তিনটি কোম্পানির ডিরেক্টর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এই তিনটি কোম্পানিরই ঠিকানা ছিল ১০০/৭৫, ভগবতী কলোনী, যশোহর রোড, ফ্লাট নম্বর-বি, দমদম, কলকাতা-৭৪। তিনটির মধ্যে দুটি কোম্পানিকে বেচে দেওয়া হয়েছে এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই তিনটি কোম্পানির খাতায় কলমে পরিচালক পদ থেকে সরে যান প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর স্ত্রী ও কন্যা। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর আপ্তসহায়কের সাথে পিকাসো রিসর্ট হোটেল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পরিচালক ছিলেন ধৃত মন্ত্রীর স্ত্রী। আপ্ত সহায়কের বাড়ি থেকে তল্লাশির সময় একটি মেরুন ডায়েরি উদ্ধার হয়, যাতে বহু তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ইডি।

চালকল ব্যবসায়ী ও রেশন দুর্নীতির অন্যতম শরিক বাকিবুর রহমানের থেকে ৯ কোটি টাকা পেয়েছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর স্ত্রী ও কন্যা। তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে কোনোরকম নথি ছাড়া ও সুদ ছাড়াই ধৃত বাকিবুর রহমান মন্ত্রীর স্ত্রী ও কন্যাকে ৯ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন। যদিও সেই ঋণ শোধ করা হয়নি। খবরে প্রকাশিত হয়েছে ঠিক একইভাবে বাকিবুর রহমানের নামেও ১৬টি ভুয়ো কোম্পানি রয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি কোম্পানিতে খাদ্যসাথী প্রকল্পে রেশনের মাধ্যমে আটা বণ্টন দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে, যার পরিমাণ ৫০ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

রেশন বণ্টন দুর্নীতির টাকা খেটেছে নির্মাণ শিল্পে। যেমন রিয়েল এস্টেটের খেটেছিল নিয়োগ দুর্নীতির টাকা। ধৃত খাদ্যমন্ত্রীর স্ত্রী আরো যে চারটি সংস্থার পরিচালক ছিলেন সেই চারটি সংস্থার মাধ্যমেই রেশন দুর্নীতির টাকা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ হয়েছিল। এই চারটি সংস্থা হল পিকাসো নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড। পিকাসো হলিডেস প্রাইভেট লিমিটেড, পিকাসো আই এন এন প্রাইভেট লিমিটেড, পিকাসো ল্যান্ড অ্যান্ড হাউসিং প্রাইভেট লিমিটেড। এই চারটি সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল একই দিনে ৯ এপ্রিল, ২০১৩ এবং একই ঠিকানায় বিসি-১১৯, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪। বর্তমানে কোম্পানিগুলি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

এই ধরনের সংস্থার মাধ্যমে টাকা লোপাট ছাড়াও বহু ক্ষেত্রেই সিনেমা, সিরিয়ালে টাকা বিনিয়োগ করতে দেখা যায়। সম্প্রতি তৈরি হওয়া একটি সিনেমায় প্রযোজক হিসেবে বাকিবুর রহমানের নাম রয়েছে এবং তাতে অভিনয় করেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বান্ধবী। প্রযোজক ও চালকল মালিক একই ব্যক্তি কিনা, তা তদন্ত করছে ইডি।

রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলায় ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইডির অভিযোগ—রেশন বণ্টন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তিনটি ভুয়ো সংস্থা খুলে ১২.০৬ কোটি কালো টাকা সাদা করা, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর পরিবারের উড়ানের টাকা দিয়েছেন বাকিবুর এবং উদ্ধার হওয়া মেরুন ডায়েরিতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর ডাক নাম, রেশন সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রি করতেন বাকিবুর। সেই বিক্রীর টাকা পাঠাতেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে। নভেম্বর, ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৬.০৩ কোট টাকা জমা করা হয়েছে এবং তাঁর মেয়ের অ্যাকাউন্টে নভেম্বর, ২০১৬ মাসে জমা পড়েছে ৩.৭৯ কোটি টাকা। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর কন্যা এখন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব। ইডির দাবি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে ১৬ কোটি টাকা আছে। সেই অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করা হয়েছে।

রাজ্যে তৃণমূল সরকারের সময়ে দুর্নীতির দুষ্টচক্র সরকারী-বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী পরিকাঠামো গড়ে তুলে চুরি, লুঠতরাজ, দুর্নীতিকে এক পেশায় পরিণত করেছে। পাশাপাশি ৭৫ ঃ ২৫ সূত্রানুযায়ী দুর্নীতি থেকে উৎসারিত অর্থে পুষ্ট দল ও সরকারকে আড়াল করার জন্য বিভিন্ন কুযুক্তি প্রচার করা হচ্ছে। যেমন উন্নয়ন চাইলে একটু দুর্নীতি সহ্য করতে হবে, বা কেন্দ্রের চক্রান্ত, ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাটার, বা বিগত সরকারের কাজ। একই সঙ্গে সহযোগিতা পাচ্ছে কর্পোরেট, অর্থপুষ্ট মিডিয়ার, একরকমের বিদ্বজ্জনের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মক ফাইট। তাই অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করার জন্য রাষ্ট্রীয়মদতে লুটেরা পুঁজির যে কার্নিভাল মহাসমারোহে করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সর্বত্র। □

সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা সহ অন্যান্য পত্রিকা

টুকরোখবর □ টুকরোখবর □ টুকরোখবর □ টুকরোখবর

বিশ্ব উষ্ণায়নের স্বাপেক্ষে পরিবর্তিত জলবায়ুর বড় আঘাত আসতে চলেছে প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায়। এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিতে পারে। ইন্ডিয়ান জার্নাল অব এনিমেল হেলথ্ এর উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা চক্রে এমনই মত ব্যক্ত করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। নদ-নদী সহ এলাকাভিত্তিক জলাশয়গুলি দূষণমুক্ত করে লাভজনক চাষে ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া একটি আশু কাজ। পরিবর্তিত জলবায়ুতে প্রাণী ও মাছ চাষের পদ্ধতিগত পরিবর্তন শীর্ষক এই আলোচনা চক্রের মূল বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট প্রাণী বিশেষজ্ঞ ড: এম এল প্রধান। তিনি বলেন, পরিবর্তিত আবহাওয়ায় গবাদিপশু ও মাছ চাষে নির্ভরশীল গরীব মানুষদের জীবিকা সুরক্ষিত রাখতে সরকারি উদ্যোগে এলাকাভিত্তিক ব্যাপক সমীক্ষা ও গবেষণা প্রয়োজন। পরিবেশের মানানসই মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীসম্পদ সংরক্ষণে এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ প্রজাতির প্রাণীসম্পদ সৃষ্টির নিবিড় অনুশীলন দরকার। সবুজায়নের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ এবং বিকল্প জ্বালানির উপর গুরুত্ব আরোপের কথা বলেন বিভিন্ন বক্তারা। □

দেশের ৪০ কোটি মানুষ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা খাতে কোনো সরকারি আর্থিক সহায়তা পান না। চিকিৎসার খরচ নিজেদের পকেট থেকে বহন করতে হয়। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান মন্ত্রকের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস নিয়ে ন্যাশনাল ইন্ডিকেটর ফ্রেমওয়ার্ক প্রোগ্রেস রিপোর্টে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই রিপোর্টে চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে একদিকে সরকারি সহায়তা না মেলা এবং অপরদিকে চিকিৎসার খরচ এবং ওষুধের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলায় বহু পরিবারকে সংসারে প্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে চিকিৎসার খরচ সামলাতে হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে দেশের জনসংখ্যার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মানুষ চিকিৎসার খরচ সামলাতে তাদের পরিবারের মাসের প্রয়োজনীয় খরচ প্রায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে। চিকিৎসার ব্যয়বৃদ্ধি তাদের একটা বড়ো আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। দেশে তথাকথিত স্বাস্থ্যবিমা সহ নানা নামের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প থাকলেও নাগরিকরা তাতেও চিকিৎসার ব্যয় সামাল দিতে পারছেন না। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করার মধ্য দিয়ে দেশের নাগরিকদের উন্নতমানের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি, সুলভে ভ্যাক্সিন ও প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল, তা তো পূরণ হয়ইনি, উলটে সরকার একদিকে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমিয়েছে, অপরদিকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছে। □

কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে দলিত সহ বিভিন্ন প্রান্তিক অংশের ছাত্রছাত্রীদের অপমান, তাঁদের সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই জাতিগত বৈষম্য বন্ধ করতে ইউজিসি'কে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বললো সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত এক নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিধিবদ্ধ এই সংস্থাকে বলেছে, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে তফসিলি জাতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য সুস্থ পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে আগামীদিনে আরও যত্ন নেওয়া উচিত, যাতে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে আত্মহত্যার মতো ঘটনা আর না ঘটে। হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত গবেষক ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা গোটা দেশকে আলোড়িত করেছিল। ২০১৬ সালে রোহিত ভেমুলা এবং তার তিনবছর পর ২০১৯ সালে একই কারণে মুম্বাইয়ের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের আদিবাসী ছাত্রী পায়েল তদভির আত্মহত্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাত-বৈষম্যকে দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করে দেয়। রোহিত এবং পায়েলের পরিবার সুপ্রিমকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। প্রান্তিক অংশের পড়ুয়া হওয়ায় হেনস্থার শিকার হয়ে আর কোনো সন্তানকে যেন নির্মম পথ বেছে নিতে না হয়, সেই আরজি জানিয়েই শীর্ষ আদালতে মামলা করেছিলেন তাঁরা। মামলার শুনানিতে এই বিষয়ে ইউজিসি কি ভাবছে, কি পরিকল্পনা নিয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা আদালতকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আবেদনকারীদের তরফে প্রবীণ আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে জাত-বৈষম্যের অভিযোগের ফয়সালা করতে ২০১২ সালে ইউজিসি একটি গাইডলাইন তৈরী করলেও তার কোনো প্রভাব ক্যাম্পাসে নেই। এবছর ইতিমধ্যে তিনজন পড়ুয়া এই বৈষম্যের কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন বলেও আদালতকে জানান তিনি। □

ইউরোপের একাধিক দেশে বেতন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, পরিবেশ দূষণের প্রতিবাদে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার, ব্রিটেনে বেতন বৃদ্ধির দাবীতে জুনিয়র ডাক্তাররা ধর্মঘটে যোগ দেন। ইতালিতে কর্মসংস্থানের দাবীকে সামনে রেখে শুরু হয় ধর্মঘট। পরিবেশ দূষণের প্রতিবাদে জার্মানিতে স্তব্ধ হয়ে পড়ে বিমান বন্দর। ব্রিটেনে স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় লাগাতার ৫ দিনের ধর্মঘট। ধর্মঘট এতটাই সর্বাত্মক রূপ নেয় যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সরকার আন্দোলনরত ডাক্তারদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে ভোর থেকেই ইতালির বিভিন্ন রেল স্টেশনে ট্রেনের অভাবে আটকে পড়েন নিত্যযাত্রী এবং পর্যটকরা। ভোর রাত থেকে ঘর্মঘটে যোগ দেন রেল শ্রমিক এবং কর্মচারীরা। নতুন কর্মী নিয়োগ, ওভারটাইম, ন্যূনতম বেতন ও কাজের পরিবেশের উন্নতির দাবীতে ধর্মঘটে সামিল হন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা। জার্মানিতে পরিবেশ কর্মীদের সুবিশাল জমায়েত দুটি বিমানবন্দরের যাবতীয় তৎপরতা থমকে দেয়। ত্রুটিপূর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ ঘটছে, এর প্রতিবাদেই ধর্মঘট। বাস্তবে অর্থনৈতিক শোষণ ব্রিটেনের জুনিয়র ডাক্তার এবং ইতালির রেল শ্রমিকদের একই প্রতিবাদের মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়েছে, আর জার্মানিতে পরিবেশকর্মীদের ধর্মঘট আসলে নয়া উদারবাদী কর্পোরেট লুঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। □

সোস্যাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত গুজরাটের ৩৩ শতাংশ মানুষ। সরকারী মদতে পুলিশি ও আইনি হেনস্থার শিকার হতে হবে বলেই তাঁরা আতঙ্কিত। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেন্টার ফর দি স্টাডি অব ডেভেলোপিং সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যাটাস অফ পোলিশিং ইন ইন্ডিয়া নামক রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে দেখা গেছে যে গুজরাটে বর্তমান সরকারের সময়ে জনতার ওপর নজরদারি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সময়ে স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকায় সেখানেও নজরদারি বেড়েছে। গুজরাটের নাগরিকরা অনলাইনে এবং স্যোসাল মিডিয়ায় যেসব রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন তা নিয়ে সম্প্রতি সমীক্ষা চালায় সংস্থাটি। সমীক্ষার রিপোর্টে স্পষ্ট, রাজনৈতিক মত প্রকাশ করলে শাসকের আইনি হেনস্থার মুখে পড়তে হবে বলে রীতিমতো আতঙ্কিত গুজরাটের বড় অংশের মানুষ। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে রাজ্যের ৩৩ শতাংশ নাগরিকই বলছেন যে এব্যাপারে তাঁরা খুবই ভয়ে থাকেন। কারণ, রাজনৈতিক মত প্রকাশ করলেই দেখা গেছে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে হেনস্থা করছে পুলিশ। মিথ্যা অভিযোগে তাঁদের শাস্তি ও জরিমানাও হয়েছে। অনলাইন মাধ্যমে কোনও রাজনৈতিক সমাবেশের উদ্যোগ নেওয়া হলে তা বানচাল করতে নেমে পড়ে পুলিশ। নজরদারি চালানো হয় মোবাইল ফোনেও। হেনস্থা হতে হয় উদ্যোক্তাদের। □

মুম্বাই আইআইটি'র ক্যান্টিনের দেওয়ালে পোস্টার লাগানো হয়েছে 'শুধুমাত্র নিরামিষাশীদের জন্য', অর্থাৎ যারা নিরামিষ খাবার খান তারাই এখানে বসতে পারবেন। ক্যান্টিনে মাছ-মাংস-ডিম পাওয়া যাবেনা এবং আমিষ খেলে ক্যান্টিনে বসাও যাবেনা। এই পোস্টার লাগানোর পরেই খাবার নিয়ে বৈষম্যের প্রতিবাদে সরব হন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। বিরাট সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হতেই নড়েচড়ে বসেন আইআইটি কর্তৃপক্ষ এক আধিকারিক দাবী করেন যে কর্তৃপক্ষের তরফে এই পোস্টার লাগানো হয়নি। কে বা কারা এই কাজ করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আলাদা আলাদা খাবারের জন্য আলাদাভাবে বসার কোনও ব্যবস্থা নেই ক্যান্টিনে। প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে দেন। তাঁরা বলেন, আইআইটির নিয়ম অনুযায়ী খাবারের কোনও বিভেদ নেই, হোস্টেল কর্তৃপক্ষ একথাই জানিয়েছেন। কয়েকজন পড়ুয়া এইধরনের পোস্টার লাগিয়ে ঝামেলার চেষ্টা করেছিল। দেশজুড়ে আইআইটিগুলিতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের পরিবেশ সৃষ্টির কারণে বারবারই খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। এবার খাবার নিয়েও বৈষম্যের পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা চলছে দেশের প্রথমসারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। □

কেন্দ্রের নতুন পেনশন প্রকল্পের অবসান ঘটিয়ে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানালেন কেন্দ্রীয় সরকারী পেনশনাররা। ৬'ই আগস্ট ফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল গভমেন্ট পেনশনার্স অরগানাইযেশনের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এই দাবী তুলেছেন প্রতিনিধিরা। কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধি। প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে যেমন নতুন পেনশন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুরনো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবী জানান, তেমনি সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে সর্বাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো ও পর্যাপ্ত স্থায়ী স্পেশালিস্ট ডাক্তারের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য সরব হন এবং আগামীদিনে এই দাবীতে নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের প্রস্তাব রাখেন। □

কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিকে কার্যত মান্যতা দিয়ে রাজ্যের নতুন শিক্ষানীতি তৈরী করছে রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রীসভা সেই শিক্ষানীতি অনুমোদন করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতিকে মান্যতা দিয়েই রাজ্যের শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, আগামী তিনবছরে ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণীর পর থেকে সেমিস্টার সিস্টেমে পড়ানো হবে। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতেও সেমিস্টার সিস্টেমে পড়ানোর কথা রাজ্যের নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে বলা হয়েছে চাকরির শুরুতে শিক্ষকদের পাঁচ বছর গ্রামের স্কুলে পড়াতে হবে। আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরে পড়াশোনা হবে মাতৃভাষায়, উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে তিন ভাষায় পড়ার সুযোগ থাকবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে আগেই তিনবছরের স্নাতকস্তরের পরিবর্তে চার বছরের স্নাতক অনার্স চালু করে দিয়েছে। একই সাথে জানা যাচ্ছে যে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই কলকাতা, প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু হতে পারে 'মাল্টিপল এন্ট্রি এগজিট' ব্যবস্থা। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রাজ্যে অনলাইন কোর্স পরিচালনা করবে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। □

ট্রাম কোম্পানির ১৯টি রুটের বাস বেসরকারিকরণ করা চলবে না বলে দাবী জানালো সি আই টি ইউ। সম্প্রতি ট্রাম কমানির হাতে থাকা ১৯টি রুটের ৪০ টি বাস বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই মর্মে টেন্ডার বা দরপত্র আহ্বান করেছে পরিবহণ দপ্তর। সি আই টি ইউ এর পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে এই টেন্ডার নোটিস বাতিলের দাবী জানানো হয়েছে। একইসাথে ওয়েস্ট বেংগল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে চিঠি দিয়ে টেন্ডার প্রত্যাহার করার দাবী জানানো হয়েছে সি আই টি ইউ অনুমোদিত ক্যালকাটা ট্রাম ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও। চিঠিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কর্মী স্বার্থ বিরোধী এই নির্দেশিকা এবং টেন্ডার নোটিস সিটিসি'র বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে প্রথম ধাপ বলে মনে করছে সংগঠন। কর্তৃপক্ষের এইধরনের সিদ্ধান্ত ট্রাম কোম্পানির ইতিহাসে নজিরবিহীন। উল্লেখ্য, টেন্ডারে বলা হয়েছে ফ্রাঞ্চাইজির নামে বেসরকারী হাতে যাবে ট্রাম কোম্পানির ১৯টি রুটের সিটিসি বাস। এর ফলে আগামী দিনে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যাত্রিভাড়া। একইসঙ্গে বেসরকারি হাতে নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা চলে গেলে চালক এবং কন্ডাক্টরদের ক্ষেত্রে বেতন ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা বজায় থাকার ক্ষেত্রেও তৈরি হবে অনিশ্চয়তা। লাভজনক রুট কেন বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া হবে এ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সি আই টি ইউয়ের বক্তব্য, দেশের সরকার যেমন দেশের সম্পদ বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছে, এরাজ্যের সরকারও একই পথ অনুসরণ করছে। □

বিভিন্ন মহল থেকে বারবার অভিযোগ উঠেছে যে তথ্যের অধিকার আইন থাকলেও গত কয়েকবছরে নানা অজুহাতে অনেক সরকারী তথ্যই নাগরিকরা জানতে চাইলেও প্রকাশ করেনি সরকার। এই অবস্থায় আইনটির ধারাগুলির যথাযথ রূপায়ন সুনিশ্চিত করার কথা বলল দেশের সুপ্রিম কোর্ট। এই আইনের ৪ নম্বর ধারার কার্যকরি প্রয়োগে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে আরজি পেশ করেছিলেন জনৈক বিকাশ জৈন। এই ধারায় সরকারী তথ্যের প্রকাশে সরকারী দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় বলা আছে যে সরকারী কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করবে। কিন্তু সরকার এই ধারার যথাযথ মান্যতা দিচ্ছে না। শুনানির পর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সমস্ত রাজ্য তথ্য কমিশনকেও তথ্যের অধিকার আইনের ধারাগুলির সঠিক রূপায়ন সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। রায়ে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলেছেন যে দায়বদ্ধতা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ভিত্তি। ক্ষমতা এবং দায়বদ্ধতা একে অপরের হাত ধরে চলে। ৩ নম্বর ধারায় যেমন দেশের নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার আছে, তেমনি ৪ নম্বর ধারায় এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন এবং সমস্ত রাজ্য তথ্য কমিশনকে সেই দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে হবে। □

অবশেষে চাঁদের বুকে পা রাখলো চন্দ্রযান। বিশ্বের মহাকাশ অভিযানে নজির গড়ে, বিজ্ঞানীদের সব হিসেব মিলিয়ে ২৩ আগস্ট, বুধবার ঠিক ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার 'বিক্রম'। দেশের চন্দ্রযান পৌঁছে গেছে একেবারে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে, যেখানে আর কোনো দেশই পৌঁছাতে পারেনি।

১৪ জুলাই, শুক্রবার দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে চাঁদের পথে পাড়ি দিয়েছিল ইসরোর চন্দ্রযান-৩। এর আগে চন্দ্রযান ২-এর সফট ল্যান্ডিং সফল হয়নি। কিন্তু সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েই ইসরোর চন্দ্রযান-৩। এর আগে চন্দ্রযান ২-এর সফট ল্যান্ডিং সফল হয়নি। কিন্তু সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েই ইসরোর এবারের সফল উৎক্ষেপণ। শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানীদের নির্দেশ মেনে গতি কমিয়ে ল্যান্ডার বিক্রম সফট ল্যান্ডিং করতে সক্ষম হয় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। ১৪০ কোটি দেশবাসী উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির এই অসাধারণ সাফল্যে।

ল্যান্ডার বিক্রমের ভেতর থেকে চাঁদের বুকে নেমে এসেছে রোবট বিজ্ঞানী 'প্রজ্ঞান'। চাঁদের বুকে নেমেই কাজ করতে লেগে পড়েছে প্রজ্ঞান। ছবি তোলা, নমুনা সংগ্রহ সহ নানাবিধ কাজ চলবে ১৪ দিন ধরে। তারপর চাঁদের বুকে নেমেই কাজ করতে লেগে পড়েছে প্রজ্ঞান। ছবি তোলা, নমুনা সংগ্রহ সহ নানাবিধ কাজ চলবে ১৪ দিন ধরে। তারপর চাঁদের বুকে রাত নেমে এলে ঘুমিয়ে যাবে প্রজ্ঞান।

এর আগে মাত্র তিনটি দেশ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চন্দ্রপৃষ্ঠে সফট ল্যান্ডিং প্রযুক্তির প্রয়োগে সাফল্য পেয়েছে। □

দীপঙ্কর বাগচী

আর্জেন্টিনার নির্বাচনে অতি দক্ষিণপন্থীদের জয়

আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অতি দক্ষিণপন্থী জাভিয়ের মিলেই জয়লাভ করেছেন। নির্বাচনের চূড়ান্ত দফায় ৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে দেশের অর্থমন্ত্রী সার্জিও মাসাকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন 'আর্জেন্টিনার ট্রাম্প' বলে পরিচিত জাভিয়ের মিলেই।

এই জয়ের ফলে লাতিন আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবারও দক্ষিণপন্থী মোড় নিল। এই জাভিয়ের মিলেই কোনো স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসেননি। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান দিয়ে তার যাত্রা শুরু। প্রথাগত রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরের একজন হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন। অনেকটা ট্রাম্পের ধাঁচে নিজেকে গড়ে তুলে দেশের সাংবিধানিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেক কিছুই তিনি পাল্টে দেবেন বলে প্রচারে ঘোষণা করেন মিলেই। মনে করা হচ্ছে এই ভাবমূর্তিই তাকে জিতিয়ে দিয়েছে।

জাভিয়ের মিলেই ২০২১ সালে সাংসদ নির্বাচিত হন। তাঁর দল 'ফ্রীডম অ্যাডভান্সেস' আর্জেন্টিনার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভেঙে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যদিও বাস্তবে তা কতটা করা সম্ভব তা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন রয়েছে। তিনি অর্থনীতির মুদ্রাকে ডলারে রূপান্তর করার কথা বলেছেন। রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী মিলেই গর্ভপাতের অধিকার আইন বাতিল করার কথা বলেছেন, যদিও এই আইন গণভোটের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কটকে ''বামপন্থীদের অসত্য প্রচার'' বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকেন। এমনকি আর্জেন্টিনার সামরিক শাসনের সময় হওয়া অত্যাচারের ঘটনাকেও বিরোধীদের অতিরঞ্জিত অপপ্রচার বলে অস্বীকার করে থাকেন। নাগরিকদের বন্দুক রাখার আইন আনার প্রতিশ্রুতিও ভোটের প্রচারে দেওয়া হয়েছে। নিজেকে ''নৈরাজ্যবাদী পুঁজিবাদী'' বলে চিহ্নিত করে দুনিয়াজোড়া সমাজবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও তার দলের প্রচারে শোনা গেছে। ভোটের প্রচারে অস্ত্র দেখানো, এমনকি অশালীন শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর নাম হয়ে গেছে ''এন লোকো'' অর্থাৎ পাগলাটে।

এহেন চরম দক্ষিণপন্থী মিলেই এর জয়ের পেছনে পর্যবেক্ষকরা মূলত মুদ্রাস্ফীতিকেই বড়ো কারণ হিসেবে দেখছেন। তীব্র মুদ্রাস্ফীতির ফলে আর্জেন্টিনার জনমানসে গভীর অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, এরই প্রতিফলন ঘটে নির্বাচনে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তিনি সেদিকেই হোক এক পরিবর্তনের মোহ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

জাভিয়ের মিলেইয়ের এই জয়লাভে অভিনন্দন জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, বলসোনারোর মতো চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

মিলেই ইজরায়েলের কট্টর অনুগামী। তাঁর প্রচারে ইজরায়েলের পতাকাও দেখা গেছে। ভোটে জয়লাভ করে মিলেই জানিয়েছেন তিনি দায়িত্ব নেবার আগে একবার আমেরিকায় যাবেন এবং সেখান থেকে তিনি ইজরায়েলেও যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। □

দীপঙ্কর বাগচী

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
51st Year, 5th & 6th Edition, September-October 2023
Regd. No. : 18484/71

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরে

৫-৬ ডিসেম্বর ঃ দিনরাত্রিব্যাপী কেন্দ্রীয় অবস্থান কর্মসূচী

কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। দেবব্রত রায় বলেন, আমাদের যন্ত্রণার কথা, কষ্টের কথা বারে বারে তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু সরকার নির্বিকার। দাবি

অনাদি সাহু

আদায়ে আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের সহকর্মীরা বিগত পাঁচ বছর ধরে নেপাল সীমান্তে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন। দেশের সরকার বলছে

শ্যামল চক্রবর্তী

রামমন্দির নির্মাণ হলেই ভারতবর্ষের মানুষের প্রকৃত মুক্তি ঘটবে। এই দুই সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আরও অসংখ্য সহকর্মী, অসংখ্য মানুষকে যুক্ত করে দুর্নীতি, লুঠ, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়াই-আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত করতে হবে। সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বি ই এফ আই-এর

নউফিল মহম্মদ সফিউল্লা

পক্ষ থেকে জয়দেব দাশগুপ্ত, এবিটিএ-র পক্ষে সুকুমার পাইন, এস এফ আই-এর পক্ষ থেকে দেবাঞ্জন দে, এ আই টি ইউ সি নেত্রী লীনা চ্যাটার্জী, টিইউসিসি নেতা অমিতাভ বসু, পি এস ইউ-র পক্ষে নউফিল মহম্মদ সফিউল্লাহ প্রমুখ। তারা প্রত্যেকেই মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কালো দিনটিকে ধিক্কার জানিয়ে সমাবেশ থেকে প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাতে গিয়ে

দেবাঞ্জন দে

সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে মানস দাস বলেন, ওয়াই চ্যানেলের যেখানে আমরা সমাবেশ করছি, তার দুটো মুখ, কিন্তু মাথা একটাই। আমাদের ওপরে যে আক্রমণ নামিয়ে আনা

তাপস ত্রিপাঠী

হচ্ছে তার মুখ দুটো কিন্তু মাথা নাগপুর। সমাবেশে ৬ ডিসেম্বরের শপথ "বিভাজনের বিরুদ্ধে চাই ঐক্য

কনীনিকা ঘোষ

শক্তির প্রত্যাঘাত" উত্থাপন করতে গিয়ে ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের আজকে এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ আদৌও ধর্মনিরপেক্ষ, সাধারণতন্ত্র থাকবে কিনা। ১৯৯২ সালের এই দিনটিতে ভারতীয় সভ্যতার বহুত্ববাদের সংস্কৃতি তথা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ওপর নির্মম আঘাত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ও এই রাজ্যে

সুমিত ভট্টাচার্য

তখনকার বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনের পক্ষে প্রশংসাজনক ভূমিকা এবং এ বিষয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাহসী ভূমিকার প্রসঙ্গ তিনি উল্লেখ করেন। এখন ওই রাজ্যে তার ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা পোষণকারী শাসক দল ও তার প্রশাসনের পক্ষে মৌলবাদী ধর্মীয় শক্তিগুলির প্রতি নরম দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে তিনি বলেন এক ভয়ঙ্কর পণিতির দিকে আমাদের ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সমাবেশকে

অনির্বান মুখার্জী

অভিনন্দিত করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সি আই টি ইউ নেতৃত্ব আভাস রায়চৌধুরী বলেন, অবস্থানের মধ্য দিয়েই লড়াই শেষ হয়ে যায় না। প্রতিটি দাবি লড়ে নিতে হবে।

সন্দীপ রায়

আপনারা লড়াইতে আছেন লড়াইয়ের এগুনো আছে, পিছনো আছে, থামা আছে। বিভাজনের রাজনীতি এ মুহূর্তে গোটা দুনিয়াজুড়ে চলছে, আপনাদের চারটি দাবিই সঠিক। যৌথ মঞ্চের রাজনৈতিক বোঝাপড়া, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক দাবি এবং না পাওয়ার লড়াইকে রাজনৈতিক লড়াইতে আপনারা রূপান্তরিত করেছেন। জেলা থেকে আন্দোলন তুলে আনছেন। আপনাদের লড়াই আন্দোলনের যা অর্জিত অধিকার তাকে কারও কাছে বন্দক দেবেন না। এমন আন্দোলন দপ্তরে দপ্তরে তৈরি করতে হবে যাতে না ইনসাফ-এর সরকারের বুকে কাঁপন ধরে। ছাত্র, যুব, কৃষক, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক সমস্ত আন্দোলনের নদীগুলির ধারা সংগ্রামের মহাসমুদ্র তৈরি করবে। সমাবেশে সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, বামফ্রন্ট সরকার আর বর্তমান সরকারের সময়কালে কর্মচারীদের পরিস্থিতি আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন। শ্রমজীবী মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণীর ওপর আক্রমণ ও আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি। দেশ ও রাজ্যকে বাঁচাতে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের গুরুত্ব প্রতিদিন বাড়ছে। লড়াইয়ের ময়দানেই জয় ছিনিয়ে আনতে হবে। সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে এই আহ্বানই ধ্বনিত হয় যা ছাত্রনেতা দেবাঞ্জন তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেছিলেন, "আমাদের দেখা হবে মিছিলে মিছিলে, কথা হবে শ্লোগানে শ্লোগানে"। "রাত্রি যতই হোক কালো / ততই কাছাকাছি ভোরের আলো।" □

দেবাশীষ রায়

রাতের সমাবেশের একাংশ

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

৫-৬ ডিসেম্বর ২০২৩ কেন্দ্রীয় অবস্থান কর্মসূচীতে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী পরিবেশিত হয়

অবস্থান মঞ্চে। সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্মসূচীটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিমের আহ্বায়ক রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। ৫ ডিসেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকা থেকে ৬ ডিসেম্বর পেনশনার্স অধিবেশন শুরুর প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও চলচ্চিত্র পরিবেশিত হয় অবস্থান মঞ্চে। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, দেশকাল, সোনারপুর সাংস্কৃতিক টিম, সুমন চ্যাটার্জী ও শ্যামলীনা কোঙার।

9 Star Welfare Foundation-এর বিশেষভাবে

সক্ষম শিশুরা এবং আলোর ফুলকির পক্ষ থেকে সুকুমার রায়ের মৃত্যুর শতবর্ষ উপলক্ষে মকশো 'আবোল-তাবোল'

পরিবেশিত হয়, যা উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। এছাড়াও

সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনুপম রায়, মৈনাক ব্যানার্জী, WBNA-র কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম। WBMOA-র পক্ষ থেকে পরিবারের শিশু শিল্পীরা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সন্দীপ দত্ত, সঞ্জীব চক্রবর্তী, পিকু ব্রহ্ম, সঞ্জীব সাহা প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করেন ম্যাডোনা দাস। এছাড়াও নবমহাকরণ অঞ্চলের পক্ষ থেকে ২৩ নভেম্বর ২০২২ কর্মচারী আন্দোলনে যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল তারই একটুকরো

স্মৃতিচারণা করেন মমতা চক্রবর্তী, রনন ঘোষ, শুভাশীষ মুখার্জী। সঙ্গীতে ছিলেন সঞ্জীব চক্রবর্তী। রাত্রিবেলা দুটি চলচ্চিত্র পরিবেশিত হয়—'সহজ পাঠের গপ্পো' ও 'রঙ দে বাসন্তী'। চলচ্চিত্র পরিবেশনের পূর্বে দক্ষিণ ২৪ পরগণা যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবির সমর্থনে শ্লোগানের মাধ্যমে সমাবেশকে উজ্জীবিত করা হয়। □

দেবাশীষ রায়

জেলাগুলিতে ব্যাপক সফল অবস্থান কর্মসূচী

জলপাইগুড়ি

বীরভূম

পুরুলিয়া

দক্ষিণ দিনাজপুর

হুগলী

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত।